সাহিত্যমেলা

বাংলা । ষষ্ঠ শ্রেণি

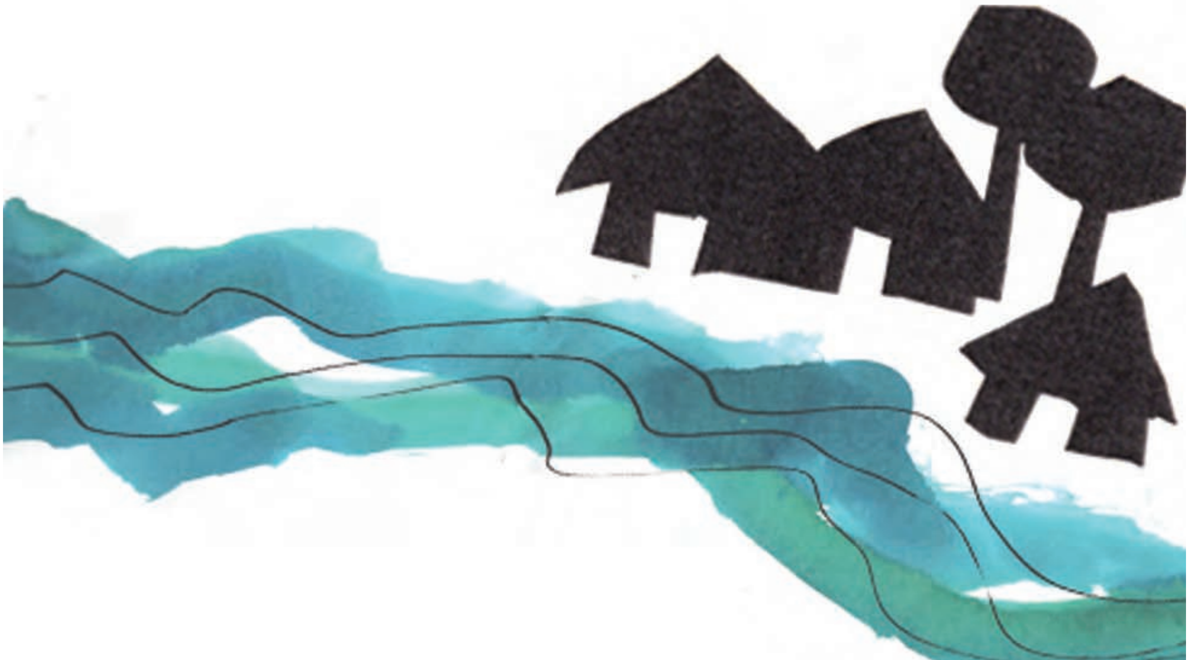

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ২০১৩
দ্বিতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৪
তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৫
চতুর্থ সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৬
পঞ্চম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৭

গ্রন্থস্বত্ব : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রকাশক
অধ্যাপিকা নবনীতা চ্যাটার্জি
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রক :
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সটবুক কর্পোরেশন
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

ভূমিকা

ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বাংলা সাহিত্যের বই 'সাহিত্যমেলা' প্রকাশ করা হলো। বাংলা ভাষাসাহিত্য পাঠ যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেকথা সকলেই স্বীকার করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে সহজ ও আকর্ষণীয় করে তুলে ধরার মধ্যেই বিষয়ের সার্থকতা। বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যসৃষ্টিকে একত্রিত করা হয়েছে 'সাহিত্যমেলা' বইটিতে। বইটি তাই বৈচিত্র্যের পরিচায়ক। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯ – এই নথিদুটিকে নির্ভর করে এই বৈচিত্র্যময় অভিনব পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-কে বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায়, নিরলস শ্রমে পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী 'সাহিত্যমেলা' বইটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রেরণা যোগাতে বাংলা বিষয়টিকে সহজ ও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত মানসম্পন্ন বইয়ের প্রয়োজন ছিল। এই বইটিতে তথ্যের ভার যাতে সাহিত্যের প্রকাশ ক্ষমতাকে কোনোভাবেই খর্ব না করে সেই দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। পাঠক্রমের মূল বিষয়গুলি ঠিকভাবে অনুধাবন করতে যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা হয় তার জন্য বইটিকে যথাসম্ভব প্রাঞ্জলভাবে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বইটির একটিই উদ্দেশ্য, ছাত্র-ছাত্রীদের কল্পনাশক্তি বিকশিত করা এবং লেখার ক্ষমতাকে উৎসাহিত করা।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ, সমাজের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রেমী মানুষ ও অলংকরণের জন্য খ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ—যাঁদের নিরন্তর শ্রম ও নিরলস চেষ্টার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের সমস্ত বিষয়ের বই ছাপিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। এই প্রকল্প রূপায়ণে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন নানাভাবে সহায়তা করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

'সাহিত্যমেলা' বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সকলকে মতামত ও পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়

ডিসেম্বর, ২০১৭
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

প্রশাসক
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক- এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। পুরো প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE Act, 2009) নথিদুটিকে আমরা অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি সমগ্র পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে।

উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের 'বাংলা' বইয়ের নাম 'সাহিত্যমেলা'। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা অনুযায়ী প্রতি শ্রেণির নতুন বইয়েরই একটি নির্দিষ্ট 'ভাবমূল' (theme) আছে। ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকের ভাবমূল হলো 'আমাদের চারপাশের পৃথিবী'। বিভিন্ন রচনার মধ্যে দিয়ে এই পাঠ্যপুস্তক সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে বাংলার প্রথিতযশা সাহিত্যকারদের রচনায়। অন্যদিকে, অনুবাদের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক সাহিত্যিকের রচনা এবং ভারতীয় সাহিত্য, অর্থাৎ এদেশের অন্যান্য রাজ্যের সাহিত্যিকদের সৃষ্টি। আমাদের চারপাশের জগতের নানান অভিমুখ আর তার বিচিত্র প্রকাশ ধরা পড়েছে লেখাগুলির মাধ্যমে। প্রতিটি পর্বে পাশাপাশি আছে একাধিক সমধর্মী বা সমবিষয়-কেন্দ্রিক রচনা। এই সজ্জার ধরনটি শিখনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দাবি করে। 'হাতে-কলমে' বিভাগে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সক্রিয়তা-নির্ভর শিখনের সম্ভার। ষষ্ঠ শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাবর্ষে নতুন পাঠ্যসূচি অনুযায়ী একটি আলাদা দ্রুতপঠন পুস্তক হিসেবে সংযোজিত হলো প্রখ্যাত লেখক সুকুমার রায়ের 'হ য ব র ল'। সেই বইটিতেও রয়েছে কল্পনার রঙিন পরিসর। উপরন্তু, আমরা চেয়েছি উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী একটি গোটা বই পড়ার সামর্থ্য এবং অভিজ্ঞতার দিকে যেন এগোতে পারে। এই দুটি পুস্তকই শিক্ষাবর্ষ থেকে ২০১৩ পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের সহায়তায় রাজ্যের শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে।

ষষ্ঠ শ্রেণির 'সাহিত্যমেলা' বইটিকে রঙে-রেখায় অপূর্ব সৌন্দর্যে অলংকৃত করে দিয়েছেন বরেণ্য শিল্পী শ্রী প্রণবেশ মাইতি। তাঁকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। বইটির শেষে সংক্ষিপ্ত 'শিখন পরামর্শ' সংযোজিত হলো। আশা করি, বইগুলি রাজ্যের শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামগ্রী হিসেবে গৃহীত হবে।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাঠ্যপুস্তকটিকে অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

ডিসেম্বর, ২০১৭
নিবেদিতা ভবন
পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০০৯১

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি) রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

ঋত্বিক মল্লিক সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায় রুদ্রশেখর সাহা মিথুন নারায়ণ বসু

স্বাতী চক্রবর্তী অপূর্ব সাহা ইলোরা ঘোষ মির্জা

সহযোগিতা

মণিকণা মুখোপাধ্যায় দেবযানী দাস দেবলীনা ভট্টাচার্য রূপা বিশ্বাস

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

প্রণবেশ মাইতি

পুস্তক নির্মাণ

বিপ্লব মণ্ডল দীপ্তেন্দু বিশ্বাস অনুপম দত্ত পিনাকী দে

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

হিরণ লাইব্রেরি

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা

জেলা গ্রন্থাগার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

বিদ্যাসাগর পত্রপত্রিকা সংগ্রহশালা, রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবন

সূচিপত্র

এক

ভরদুপুরে
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
পৃষ্ঠা—১

দুই

সেনাপতি শংকর
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
পৃষ্ঠা—৫

মিলিয়ে পড়ো : খোলামেলা দিনগুলি — শান্তিসুধা ঘোষ

তিন

পাইন দাঁড়িয়ে আকাশে নয়ন তুলি
হাইনরিখ্ হাইনে
পৃষ্ঠা—১৬

গান

আকাশভরা সূর্য-তারা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পৃষ্ঠা—১৯

চার

মন-ভালো-করা
শক্তি চট্টোপাধ্যায়
পৃষ্ঠা—২০

মিলিয়ে পড়ো : মেনি — কুমুদরঞ্জন মল্লিক

পাঁচ

পশু-পাখির ভাষা
সুবিনয় রায়চৌধুরী
পৃষ্ঠা—২৩

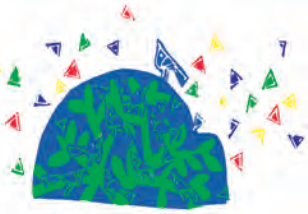

ছয়

ঘাস ফড়িং
অরুণ মিত্র
পৃষ্ঠা—২৮

সাত

কুমোরে-পোকার বাসাবাড়ি
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
পৃষ্ঠা—৩১

মিলিয়ে পড়ো : আমার ময়ূর— প্রিয়ম্বদা দেবী

আট

চিঠি
জসীমউদ্দিন
পৃষ্ঠা—৩৯

নয়

মরশুমের দিনে
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
পৃষ্ঠা—৪২

মিলিয়ে পড়ো : খোজা খিজির উৎসব — বিনয় ঘোষ

দশ

হাট
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
পৃষ্ঠা—৫৩

এগারো

মাটির ঘরে
দেয়ালচিত্র
তপন কর
পৃষ্ঠা—৫৭

গান

ঝুমুর
দুর্যোধন দাস
পৃষ্ঠা—৬২

বারো

পিঁপড়ে
অমিয় চক্রবর্তী
পৃষ্ঠা—৬৩

তেরো

ফাঁকি
রাজকিশোর
পট্টনায়ক
পৃষ্ঠা—৬৬

গান

উজ্জ্বল এক ঝাঁক
পায়রা
বিমলচন্দ্র ঘোষ
পৃষ্ঠা—৭৬

চোদ্দো

চিত্রগ্রীব
ধনগোপাল
মুখোপাধ্যায়
পৃষ্ঠা—৭৭

পনেরো

আশীর্বাদ
দক্ষিণারঞ্জন
মিত্র মজুমদার
পৃষ্ঠা—৯০

ষোলো

এক ভূতুড়ে কাণ্ড

শিবরাম চক্রবর্তী

পৃষ্ঠা—৯৫

সতেরো

বাঘ

নবনীতা দেবসেন

পৃষ্ঠা—১০১

আঠারো

বঙ্গ আমার জননী আমার

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

পৃষ্ঠা—১০৫

উনিশ

শহিদ যতীন্দ্রনাথ

আশিসকুমার মুখোপাধ্যায়

পৃষ্ঠা—১০৯

গান

চল রে চল সবে

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৃষ্ঠা—১১৮

কুড়ি

মোরা দুই সহোদর ভাই

কাজী নজরুল ইসলাম

পৃষ্ঠা—১১৯

একুশ

ধরাতল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৃষ্ঠা—১২২

মিলিয়ে পড়ো : সেথায় যেতে যে চায়
বন্দে আলী মিয়া

বাইশ

হাবুর বিপদ

অজেয় রায়

পৃষ্ঠা—১২৬

মিলিয়ে পড়ো : না পাহারার পরীক্ষা— শঙ্খ ঘোষ

তেইশ

কিশোর বিজ্ঞানী

অন্নদাশঙ্কর রায়

পৃষ্ঠা—১৩৯

চব্বিশ

ননীদা নট আউট

মতি নন্দী

পৃষ্ঠা—১৪২

বই পড়ার কায়দা কানুন

পৃষ্ঠা—১৪৮

শিখন পরামর্শ

পৃষ্ঠা—১৫৩

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : **প্রণবেশ মাইতি**

ভরদুপুরে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ওই যে অশথ গাছটি, ও তো
পথিকজনের ছাতা,
তলায় ঘাসের গালচেখানি
আদর করে পাতা।
চরছে দূরে গোরুবাছুর,
গাছের তলায় শুয়ে,
দেখছে রাখাল মেঘগুলো যায়
আকাশটাকে ছুঁয়ে।

খোলের মধ্যে বোঝাই করে
শুকনো খড়ের আঁটি
নদীর ধারে বাঁধা কাদের
ওই বড়ো নৌকাটি।
কেউ কোথা নেই, বাতাস ওড়ায়
মিহিন সাদা ধুলো,
ভরদুপুরে যে যার ঘরে
ঘুমোচ্ছে লোকগুলো।
শুধুই কী আর মানুষ ঘুমোয়,
যে জানে, সে-ই জানে
আঁচল পেতে বিশ্বভুবন
ঘুমোচ্ছে এইখানে।

হাতেকলমে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (জন্ম ১৯২৪) : জন্মস্থান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলা। *সত্যযুগ* পত্রিকার সাংবাদিকরূপে কর্মজীবন শুরু করেন, পরবর্তীকালে *আনন্দবাজার পত্রিকা* -র সঙ্গে যুক্ত হন। বহুদিন তিনি *আনন্দমেলা* সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলা কবিতার জগতে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অত্যন্ত জনপ্রিয় নাম। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে — *নীল নির্জন, অন্ধকার বারান্দা, কলকাতার যীশু* প্রভৃতি। *উলঙ্গ রাজা* কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি *সাহিত্য অকাদেমি* পুরস্কার লাভ করেছেন।

১.১ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্মস্থান কোথায়?

১.২ তাঁর লেখা দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ 'অশথ গাছ'কে পথিক জনের ছাতা বলা হয়েছে কেন?

২.২ রাখালরা গাছের তলায় শুয়ে কী দেখছে?

২.৩ নদীর ধারের কোন দৃশ্য কবিতায় ফুটে উঠেছে?

শব্দার্থ : গালচে—কার্পেট, ঘরের মেঝেতে পাতার শৌখিন ফরাশ। খোল— ফাঁপা আবরণ। মিহিন —সূক্ষ্ম, অতি ক্ষুদ্র।

৩. **একই অর্থযুক্ত শব্দ কবিতা থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো :** তৃণ, তটিনী, গোরক্ষক, পৃথিবী, জলধর।

৪. **নীচের বিশেষ্য শব্দগুলিকে বিশেষণে ও বিশেষণ শব্দগুলিকে বিশেষ্যে পরিবর্তিত করো :** ঘাস, রাখাল, আকাশ, মাঠ, আদর, গাছ, লোক।

৫. **পাশে দেওয়া শব্দগুলির সঙ্গে উপসর্গ যোগ করে নতুন শব্দ তৈরি করো :** নদী,আদর, বাতাস।

৬. **নীচের বাক্য বা বাক্যাংশগুলির থেকে উদ্দেশ্য ও বিধেয় চিহ্নিত করে উদ্দেশ্য অংশের সম্প্রসারণ করো:**

৬.১ ওই যে অশথ গাছটি, ও তো পথিকজনের ছাতা।

৬.২ কেউ কোথা নেই, বাতাস ওড়ায় মিহিন সাদা ধুলো।

৬.৩ আঁচল পেতে বিশ্বভুবন ঘুমোচ্ছে এইখানে।

৭. 'বিশ্বভুবন' শব্দে 'বিশ্ব' আর 'ভুবন' শব্দদুটির একত্র উপস্থিতি রয়েছে যাদের অর্থ একই। এমন পাঁচটি নতুন শব্দ তুমি তৈরি করো।

৮. **ক্রিয়ার কাল নির্ণয় করো (কোনটিতে কাজ চলছে/ কোনটিতে বোঝাচ্ছে কাজ শেষ হয়ে গেছে) :**

৮.১ চরছে দূরে গোরুবাছুর।

৮.২ দেখছে রাখাল মেঘগুলো যায় আকাশটাকে ছুঁয়ে।

৮.৩ নদীর ধারে বাঁধা কাদের ওই বড়ো নৌকাটি।

৮.৪ বাতাস ওড়ায় মিহিন সাদা ধুলো।

৮.৫ আঁচল পেতে বিশ্বভুবন ঘুমোচ্ছে এইখানে।

৯. **নীচের বাক্যগুলির গঠনগত শ্রেণিবিভাগ করো (সরল/যৌগিক/জটিল) :**

৯.১ তলায় ঘাসের গালচেখানি আদর করে পাতা।

৯.২ ওই যে অশথ গাছটি, ও তো পথিকজনের ছাতা।

৯.৩ ভরদুপুরে যে যার ঘরে ঘুমোচ্ছে লোকগুলো।

৯.৪ যে জানে, সেই জানে।

১০. 'ওই যে অশথ গাছটি...' অংশে 'ওই' একটি দূরত্ববাচক নির্দেশক সর্বনাম। এমন আরও কয়েকটি সর্বনামের উদাহরণ দাও। যেমন — ও, উহা, উনি, ওঁরা ইত্যাদি।

১১. 'পথিকজনের ছাতা'— সম্বন্ধপদটি চিহ্নিত করো, কবিতায় থাকা সম্বন্ধপদ খুঁজে লেখো আর নতুন সম্বন্ধপদ যুক্ত শব্দ তৈরি করো। যেমন — গোঠের রাখাল, দুপুরের ঘুম।

১২. 'ওই বড়ো নৌকাটি' বলতে বোঝায় একটি নৌকোকে। নৌকার সঙ্গে এখানে 'টি' নির্দেশক বসিয়ে একবচন বোঝানো হয়েছে। এরকম একটিমাত্র একবচনের রূপ বোঝাতে কোন কোন নির্দেশক ব্যবহৃত হতে পারে, তা উদাহরণ দিয়ে লেখো।

১৩. কবিতা থেকে বহুবচনের প্রয়োগ রয়েছে এমন শব্দ খুঁজে নিয়ে লেখো। প্রসঙ্গত , শব্দকে আর কী কী ভাবে আমরা বহুবচনের রূপ দিতে পারি, তা উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দাও।

১৪. **নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :**

১৪.১ 'আঁচল পেতে বিশ্বভুবন ঘুমোচ্ছে এইখানে'—কবির এমন ভাবনার কারণ কী?

১৪.২ 'ভরদুপুরে' কবিতায় গ্রামবাংলার এক অলস দুপুরের ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। কবিতায় ফুটে ওঠা সেই ছবিটি কেমন লেখো।

১৪.৩ কোনো এক ছুটির দিনে দুপুরবেলায় তোমার বাড়ির চারপাশ জুড়ে কেমন পরিবেশ সৃষ্টি হয় তা জানিয়ে বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো।

১৪.৪ তোমার দেখা একটি অলস দুপুরের ছবি আঁকো।

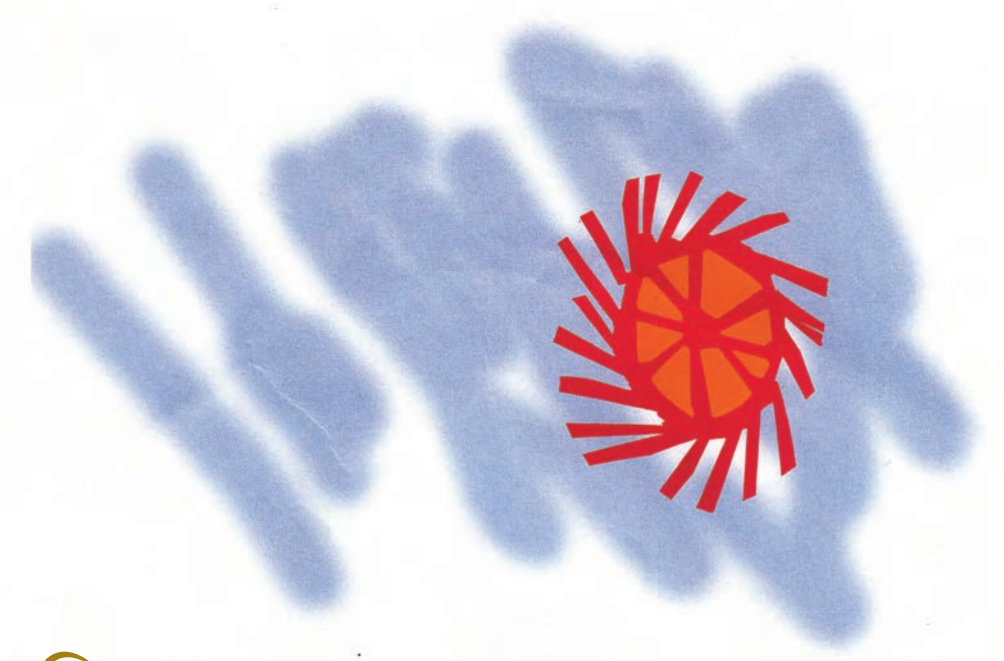

সেনাপতি শংকর

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

এখানে বাতাসের ভিতর সবসময় ভিজে জলের ঝাপটা থাকে। মনে হবে কে যেন ভালো করে বেটে জলের মিহিদানা মিশিয়ে দিয়েছে। কারণ আর কিছুই নয়— পাঁচ-সাত মাইলের ভিতর বঙ্গোপসাগর। পাগলা বাতাসে তার ঢেউয়ের গুঁড়ো সবসময় উড়ে আসছে।

আকন্দবাড়ি স্কুলের ক্লাস ফাইভে বিভীষণ দাশ এমু পাখির কথা বলছিলেন। প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্লাস। বইতে পাখির ছবি। কাছাকাছি ভেটুরিয়া, সাঁইবাড়ি, ঘোলপুকুর আর আকন্দবাড়ির জনা ত্রিশেক ছেলেমেয়ে বসে।

স্কুলবাড়ির ছাদে টালি। মাটির দেয়াল। মাটির মেঝে। কাঠের বেঞ্চ। জানালায় কোনো শিক নেই। সেই জানালা দিয়ে মেঘ দেখা যায় আকাশের। দেখা যায় পাখি উড়ছে। সেদিকে তাকিয়ে একটি ছেলে আনমনা হয়ে পড়েছিল। নারকেল গাছের মাথার ওপর দিয়ে কত উঁচুতে ডানা মেলে শঙ্খচিল ভাসছে। এক-একদিন রাতে স্বপ্নের ভিতর সেও অমন ভেসে পড়ে। ঘোলপুকুরে গাব গাছের উঁচু ডাল থেকে ঝাঁপ দিচ্ছে বড়োদিঘিতে। সিধে জলে না পড়ে সে পাখির মতো ভাসছে। ডানার বদলে দুই হাতে বাতাস কেটে। বাতাস যেন জল। পিছনে দু-পা ঠেলে দিয়ে আরও এগিয়ে যাচ্ছে। উঁচুতে। আরও উঁচুতে। অনেকটা ওই শঙ্খচিলদের মতোই।

এই শংকর। শংকর—

চমকে উঠল ছেলেটি। এতক্ষণ যেন সে ক্লাসের বাইরে শঙ্খচিলদের সঙ্গেই আকাশে উড়ছিল। থতোমতো খেয়ে উঠে দাঁড়াল। হ্যাঁ মাস্টারমশাই—

বিভীষণ দাশ প্রায় ভেংচে উঠলেন, হ্যাঁ মাস্টারমশাই! খুব মন পড়াশুনোয়! চোখ কোন দিকে ছিল এতক্ষণ? কী দেখছিলে?

শংকর একদম চুপ। স্কুলের সামনে ধানক্ষেতে রোয়া ধান সবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ঘন সবুজ। আর লাইন দিয়ে রোয়া। তার ওপর এইমাত্র একখানা মেঘের ছায়া পড়ল। ছায়া সরে যাচ্ছে। আর সেখানে রোদ এসে ঢুকছে।

বিভীষণ দাশ চটে গিয়ে বললেন, কী দেখছিলে বাইরে?

শংকর ঘাবড়ে গেল। শঙ্খচিল মাস্টারমশাই—আকাশে—

ওঃ! শঙ্খচিল! আমি কী পড়াচ্ছি বলো তো?

এমু কথাটা একবার তার কানে ঢুকেছিল। শংকর তাই বুক ঠুকে বলছিল, এমু পাখি মাস্টারমশাই—

এমু পাখি দেখেছ কখনও?

হ্যাঁ মাস্‌সাই—।

এদিকে সবাই মাস্টারমশাই কথাটা তাড়াতাড়িতে বলে মাস্‌সাই।

কোথায় দেখলে?

ঘোলপুকুরে বড়োদিঘির পাড়ে — সবেদা গাছের ডালে এসে বসেছিল।

সবেদা গাছের ডালে এসে বসেছিল! কেমন দেখতে সে এমু পাখি?

শংকর বুঝল, কোথাও একটা বড়ো ভুল হয়ে যাচ্ছে। তাই মাস্‌সাইয়ের কথায় ঠাট্টার সুর। তবু তার যেমন মনে পড়ল তেমনই সে বলল, খুব গাঢ় ছাই রং মাস্‌সাই। বাজপাখির চেয়েও বড়ো—চওড়া বুক—উড়ে গেলে ডানায় বাতাস কাটার শব্দ হয় জোরে—এমনি অন্য পাখিরা তখন ভয়ে সরে যায়।

ভয়ে সরে যায়? বলি এটা কি পঞ্চানন অপেরা পেয়েছ? বানিয়ে বানিয়ে যে পার্ট বলে যাচ্ছ খুব!

সারা ক্লাস হাসিতে ফেটে পড়ল। বিভীষণ দাশ কড়া মাস্টারমশাই। গম্ভীর গলায় বললেন, এমু পাখির বাসস্থান আন্ডিজ পর্বতমালা। তিন বছরে একবার মোটে দুটো করে বড়ো বড়ো ডিম পাড়ে। সে কোন দুঃখে অত দূর দেশ থেকে ঘোলপুকুরের বড়োদিঘির পাড়ে সবেদা গাছের ডালে এসে বসবে? অ্যাঁ? আর এমু হলো গিয়ে দৌড়বাজ পাখি। খুব দৌড়ায়। উড়তেই পারে না। ঘোলপুকুরে তুমি এমু পেলে কোত্থেকে? বলো। বলতেই হবে—

শংকর মুষড়ে পড়ল। কিন্তু তার মনে হচ্ছে — সে দেখেছে। ক্লাসসুদ্ধ সবাই ফিক ফিক করে হাসছে। কোথায় দেখেছে? দেখে থাকতে পারে? তবে কি প্রকৃতিবিজ্ঞান বইয়ের ছবিতে দেখল। না। তাহলে? সাহস করে বলল, বলব মাস্‌সাই?

বলো।

তাহলে স্বপ্নে একদিন দেখেছি মাস্‌সাই। বেশ বড়ো সাইজের পাখি।

সারা ক্লাস হাসিতে ফেটে পড়ল। হাসি থামাতে বিভীষণ দাশ বললেন, স্বপ্নে দেখেছ?

হ্যাঁ মাস্‌সাই। নইলে আর কোথায় দেখব? আপনি তো বললেন এমু পাখি থাকে আভিজ পাহাড়ে। সে পাহাড় কোথায় আমি জানি না। স্বপ্নে আরও অনেক রকমের পাখি আসে মাস্‌সাই—

চুপ! —বলে ধমকে উঠলেন বিভীষণ দাশ। তোমার বাবার নাম কী?

আজ্ঞে অভিমন্যু সেনাপতি।

তাকে আসতে বলবে কাল। আমি কথা বলব।

বাবা তো আসতে পারবে না মাস্‌সাই—

কেন?

বাবার খুব অসুখ।

এমন সময় সেকেন্ড বেঞ্চ থেকে সমীরকান্ত দীক্ষিত উঠে দাঁড়িয়ে হাসি চাপতে চাপতে বলল, ওর খুব পেট গরম মাস্‌সাই—তাই রোজ স্বপ্ন দেখে—

বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে বিভীষণ দাশ জানতে চাইলেন, পেট গরম কেন?

গাছে গাছেই সারাদিন থাকে। গাব, জাম, নোনা, ডাব খেয়ে খেয়ে বেড়ায়। পেট গরম হবে না তো কী।

শংকর সেনাপতি আর বিশেষ কিছু বলতে পারল না। কী কুক্ষণেই যে সে ওদের স্বপ্নের কথা বলেছিল।

স্বপ্ন তো সে সত্যিই দেখে। রোজই প্রায় দেখে। সেসব স্বপ্নে সে ওড়ে। পাখি হয়ে। আবার ধপ করে স্বপ্নের ভিতর সে খাট থেকে পড়েও যায়। পড়ে গিয়ে ঘুম ভাঙলে টের পায়—না, সে পড়েনি। বাঁ পায়ের শিরায় টান ধরেছে।

স্বপ্নেই সে এমু পাখি দেখে থাকবে। গাঢ় ছাই রঙের বিরাট এক পাখি। ঘোলপুকুরে দিঘির পাড়ে সবেদা গাছের ডালে এসে বসেছিল। অনেকটা বাজপাখির মতো। তবে তার চেয়েও বড়ো। দূর থেকে কাকের দল চেঁচাচ্ছিল। পাখিটা উড়ে যেতে ডানায় বাতাস কাটার শব্দ হয়েছিল। অথচ বিভীষণ মাস্‌সাই বলছেন — এমু উড়তে পারে না— দৌড়োয়—দৌড়বাজ পাখি তো!

জেগে থাকতে দেখা আর স্বপ্নে দেখা জিনিস আজকাল শংকরের গুলিয়ে যাচ্ছে। স্বপ্নের দেখাকে মনে হয় জেগে থাকতে দেখেছি। জেগে থাকতে দেখা জিনিস মনে হয় স্বপ্নে দেখেছি।

হঠাৎ বিভীষণ মাস্‌সাই চিৎকার করে বললেন, দাঁড়িয়ে আছ কেন? বোসো।

সঙ্গে সঙ্গে শংকর বসে পড়ল। সে তার স্বপ্নের কথা আর কাউকে কখনও বলবে না। বিশ্বাস করে বলার ফল তো এই। স্বপ্নে সে অনেক কিছু জানতে পেরেছে। যেমন স্বপ্নের বাতাসের রং নীলচে। বাড়ি-ঘরদোর খয়েরি রঙের। স্বপ্নে ধাক্কা খেলে কিংবা গুঁতো খেলে কোনো ব্যথাই লাগে না। অনেকটা যেন ঘোলপুকুরে বড়োদিঘিতে ডুব দিয়ে মাটি তোলার পর ভেসে ওঠার মতো। আপসে ভুস করে ভেসে ওঠা। জলের নীচে পোঁতা বাঁশে গা ঘষে গেলেও টের পাওয়া যায় না।

বিভীষণ মাস্টারমশাই বলছিলেন, পাখি দেখার জন্য যখন মাঠে বা বাগানে ঘুরবে— তখন খুব সাবধানে পা টিপে টিপে চলবে— যেন পায়ের শব্দ না হয়। জামাকাপড়ের রং শুকনো পাতার রং বা জলপাই রঙের হলে ভালো। এই রং গাছের পাতার সঙ্গে মিশে থাকে। বেগুনি রঙের জামা পরলেও ভালো—পাখিরা বেগুনি রং দেখতে পায় না।

তন্ময় হয়ে শুনছিল শংকর। হঠাৎ মাস্টারমশাই তার দিকে তাকিয়ে বললেন, শংকর সেনাপতি—

হ্যাঁ মাস্সাই বলে তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়াল শংকর।

তুমি তো গাছে গাছে ঘোরো—

একগাল হেসে ফেলল শংকর। তা মাস্সাই—

তুমি তো অনেকরকম পাখি দ্যাখো। তাদের কথা বলতে পারো?

বিভীষণ মাস্সাই যে তাকে এমন একটা কথা বলবেন—তা ভাবতে পারেনি শংকর। সে লজ্জার সঙ্গে বলল, মাছরাঙা—

আর?

হাঁড়িচাচা। ডৌখোল। পানকৌড়ি। তিতির মাস্সাই—

বাঃ! যত পারবে চোখ খোলা রেখে এই পৃথিবীর পাখি, গাছপালা, মেঘ, আলো — সব দেখে নেবে।

শংকরের বুকটা গর্বে ফুলে উঠল।

বিভীষণ মাস্টারমশাই বললেন, এই খোলামেলা পৃথিবীই সবচেয়ে বড়ো বই। তাকে চোখ ভরে দেখাই সবচেয়ে বড়ো পড়াশুনো।

হাতে কলমে

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৩—২০০১) : জন্মস্থান অধুনা বাংলাদেশের খুলনা। বহুবিচিত্র জীবিকার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই সাংবাদিক-লেখকের সব রচনাতেই সেই বিচিত্রতার স্বাদ পাওয়া যায়। বহু সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত এই লেখক ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর *শাহাজাদা দারাশুকো* উপন্যাসের জন্য *সাহিত্য অকাদেমি* পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর অন্যান্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে — *বেঁচে থাকার স্বাদ, ভাস্কো দা গামার ভাইপো, মনে কি পড়ে, কুবেরের বিষয়আশয়, ঈশ্বরীতলার রুপোকথা, ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্লেক।* বর্তমান রচনাংশটি তাঁর *সেনাপতি শংকর* গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১.১ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা দুটি বইয়ের নাম লেখো।

১.২ তিনি কোন বইয়ের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন?

২. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ আকন্দবাড়ি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা কোন কোন জায়গা থেকে পড়তে আসে?

২.২ স্কুলের জানলা থেকে কী কী দেখা যায়?

২.৩ শঙ্কর কীসের স্বপ্ন দেখে?

২.৪ শঙ্করের স্বপ্নে বাতাসের রং কী?

২.৫ এমু ছাড়া উড়তে পারে না শুধু দৌড়তে পারে এমন একটি পাখির নাম লেখো।

৩. **গল্প থেকে একই অর্থযুক্ত শব্দ খুঁজে নিয়ে লেখো :**

বিদ্যালয়, অনিল, জগৎ, একাগ্র-চিত্ত, পাখা, রোপণ করা।

৪. **বিপরীতার্থক শব্দ লিখে তা দিয়ে বাক্য রচনা করো :** ভিজে, রাত, বাইরে, গাঢ়, বিশ্বাস।

৫. **সন্ধি বিচ্ছেদ করো :** বঙ্গোপসাগর, তন্ময়, সাবধান, ত্রিশেক, পঞ্চানন।

৬. **নীচের শব্দগুলির কোনটি বিশেষ্য এবং কোনটি বিশেষণ তা খুঁজে নিয়ে আলাদা দুটি স্তম্ভে সাজাও। এরপর বিশেষ্যগুলির বিশেষণের রূপ এবং বিশেষণগুলির বিশেষ্যের রূপ লেখো :**

প্রকৃতি, ব্যথা, মাটি, বিশ্বাস, জল, মাঠ, শব্দ।

৭. **সমোচ্চারিত বা প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দগুলির অর্থ লিখে বাক্যে প্রয়োগ করো :**

ভাষা—	পড়ে—	শংকর—	মাথা—	বাঁশ—
ভাসা—	পরে—	সংকর—	মাতা —	বাস—

৮. গল্পে বেশ কিছু পাখি ও গাছের নাম আছে। এই পাখি ও গাছের নামের তালিকা তৈরি করে এগুলি সম্পর্কে তথ্য জানিয়ে নামের পাশে পাশে লেখো। প্রয়োজনে শিক্ষক-শিক্ষিকার সাহায্য নাও। এগুলি ছাড়াও তোমার জানা আরও কিছু পাখি আর গাছের নাম, তাদের বৈশিষ্ট্য লিখে নীচের ছকটি পূরণ করো।

পাখির নাম	আকার	রং	ঠোঁট	লেজ	পা	ঝুঁটি
দুর্গা টুনটুনি	ছোটো	বেগুনি	সরু, লম্বা, বাঁকানো	ছোটো	সরু, লম্বা	নেই

গাছের নাম	আকার	কী জাতীয়	পাতাগুলো কেমন	ফুল	ফল	কোথায় দেখেছ

৯. নীচে কতগুলি উপসর্গ দেওয়া হলো। গল্প থেকে উপযুক্ত শব্দ খুঁজে নিয়ে এই উপসর্গগুলি যুক্ত করে কয়েকটি নতুন শব্দ তৈরি করো :

উপসর্গ	শব্দ	নতুন শব্দ
বি		
প্র		
নি		
সু		
আ		

১০. নীচের বাক্যগুলি থেকে সংখ্যাবাচক শব্দ খুঁজে বের করো :

১০.১ পাঁচ সাত মাইলের ভেতর বঙ্গোপসাগর।

১০.২ জনা ত্রিশেক ছেলেমেয়ে বসে।

১০.৩ সেদিকে তাকিয়ে একটি ছেলে আনমনা হয়ে পড়েছিল।

১০.৪ এক একদিন রাতে স্বপ্নের ভেতর সেও অমন ভেসে পড়ে।

শব্দার্থ : রোয়া — রোপণ করা। ঘাবড়ে — থতোমতো খাওয়া, হতবুদ্ধি হওয়া। মুষড়ে — হতাশ হয়ে। তন্ময় — একমনা। গর্ব — অহংকার।

১১. নীচের বাক্যগুলি থেকে অনুসর্গ খুঁজে বার করো। প্রতিটি বাক্যের ভিতর যেসব শব্দ আছে তাদের সঙ্গে কী কী বিভক্তি যুক্ত হয়েছে দেখাও।

১১.১ এখানে বাতাসের ভেতর সবসময় ভিজে জলের ঝাপটা থাকে।

১১.২ মাটির মেঝে।

১১.৩ সেই জানলা দিয়ে মেঘ দেখা যায় আকাশের।

১১.৪ স্বপ্নের ভেতর সে খাট থেকে পড়েও যায়।

১১.৫ সে তার স্বপ্নের কথা আর কাউকে কখনও বলবে না।

১২. নীচের বাক্যগুলি থেকে উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ খুঁজে নিয়ে লেখো :

১২.১ আকন্দবাড়ি স্কুলের ক্লাস ফাইভে বিভীষণ দাশ এমু পাখির কথা বলছিলেন।

১২.২ স্কুলের সামনে ধানক্ষেতে রোয়া ধান সবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

১২.৩ গাঢ় ছাইরঙের বিরাট এক পাখি।

১২.৪ তন্ময় হয়ে শুনছিল শংকর।

১২.৫ এই খোলামেলা পৃথিবীই সবচেয়ে বড়ো বই।

উদ্দেশ্য	বিধেয়

১৩. 'কথা', 'চোখ' — এই শব্দগুলির প্রত্যেকটিকে দুটি আলাদা অর্থে ব্যবহার করে বাক্য লেখো।

১৪. নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কোনটি সরল, কোনটি জটিল ও কোনটি যৌগিক বাক্য তা খুঁজে নিয়ে লেখো :

১৪.১ জানলায় কোনো শিক নেই।

১৪.২ জেগে থাকতে দেখা আর স্বপ্নে দেখা জিনিস আজকাল শংকরের গুলিয়ে যাচ্ছে।

১৪.৩ পাখি দেখার জন্য যখন মাঠে বা বাগানে ঘুরবে-তখন খুব সাবধানে পা টিপে টিপে চলবে।

১৪.৪ বিভীষণ মাস্‌সাই যে তাকে এমন একটা কথা বলবেন তা ভাবতে পারেনি শংকর।

১৫. নীচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য তৈরি করে একটি অনুচ্ছেদের রূপ দাও :

গুঁড়ো, প্রকৃতি, জানলা, ডানা, ছায়া, শব্দ, স্বপ্ন, খোলামেলা।

এভাবে শুরু করতে পারো :

বাইরে হাওয়ায় বৃষ্টির গুঁড়ো উড়ে বেড়াচ্ছে। জানলা দিয়ে একমনে তাকিয়ে দেখছে ঝিমলি। প্রকৃতি যেন রোজ নতুন নতুন সাজে এসে হাজির হয়। গাছে বসা সবুজ টিয়ার ডানায় মুক্তোর মতো বিন্দু বিন্দু জল। ...

১৬. নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :

১৬.১ ‘পাগলা বাতাসে তার ঢেউয়ের গুঁড়ো সবসময়ে উড়ে আসছে’ —এখানে বাতাসকে ‘পাগলা’ বলা হলো কেন?

১৬.২ ‘বিভীষণ দাশ এমু পাখির কথা বলেছিলেন।’ —গল্পের ‘বিভীষণ দাশ’-এর পরিচয় দাও। এমু পাখি ছাড়া গল্পে আর কোন পাখির প্রসঙ্গ এসেছে?

১৬.৩ ‘শংকর বুঝল, কোথাও একটা বড়ো ভুল হয়ে যাচ্ছে।’ —কে এই শংকর? তার স্বভাবের প্রকৃতি কেমন? তার যে কোথাও একটা বড়ো ভুল হয়ে যাচ্ছে —এটা সে কীভাবে বুঝতে পারল?

১৬.৪ এমু পাখির যে বর্ণনা শংকর দিয়েছিল তার সঙ্গে পাখিটির মিল বা অমিল কি লেখো।

১৬.৫ ‘এটা কি পঞ্চানন অপেরা পেয়েছ?’ — ‘অপেরা’ বলতে কী বোঝ? এখানে অপেরার প্রসঙ্গ এল কেন?

১৬.৬ ‘বলো, বলতেই হবে’— কাকে একথা বলা হলো? উদ্দিষ্টকে কোন কথা বলতে হবে বলে দাবি জানানো হয়েছে?

১৬.৭ গল্প অনুসরণে আকন্দবাড়ি স্কুলে সে প্রকৃতিবিজ্ঞান ক্লাসে উদ্ভুত পরিস্থিতি নিজের ভাষায় লেখো।

১৬.৮ ‘স্বপ্নে সে অনেক কিছু জানতে পেরেছে।’ —কার স্বপ্ন দেখার কথা বলা হয়েছে? স্বপ্ন দেখে সে কী জেনেছে ?

১৬.৯ ‘পাখি দেখার জন্য যখন মাঠে বা বাগানে ঘুরবে’ —তখন কীভাবে চলতে হবে?

১৬.১০ ‘তাদের কথা বলতে পারো?’ —এই প্রশ্নের সূত্র ধরে বক্তা-শ্রোতার কথোপকথনের অংশটুকু নিজের ভাষায় লেখো।

মিলিয়ে পড়ো

আগের গল্পে প্রকৃতি থেকে শেখার কথা তোমরা পড়লে। স্কুলের বাইরে প্রকৃতির কাছে থেকে কী কী শেখা যায় লেখাটি পড়ে দেখো।

খোলামেলা দিনগুলি

শান্তিসুধা ঘোষ

মহানগরীর হট্টগোল থেকে দূরে এসে, বাঁধাধরা স্কুলজীবনের ছককাটা জীবনযাত্রার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বরিশালের এই মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রকৃতি যেন আমার চারপাশে নিবিড় হয়ে ঘনিয়ে এল। বাবাকে শৈশবাবধি দেখেছি প্রকৃতির পূজারি। শুধু কাব্য বা দর্শনে নয়, মাটির ধূলার সঙ্গে তাঁর একান্ত প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠতা। নিজের হাতে খুরপি সহযোগে মাটি তৈরি করে, জলের ঝারি হাতে পুকুর থেকে জল তুলে চারাগাছগুলিতে সকাল সন্ধ্যা নিয়মিত জলসেচন দ্বারা ফুলের বাগানে ও ফসলের ক্ষেতে কী অপূর্ব সুন্দর করেই না আমাদের বাড়িখানা তিনি সাজিয়েছিলেন। সেই অনুরাগ বোধহয় আমাদেরও রক্তের ধারায় বয়ে এসেছে। সে আজ অবকাশ পেয়ে আমার মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল যেন। সভ্যতার দমবন্ধ করা অবরোধ এখানে এসে যেন একবারে হালকা হয়ে গেছে। এখানে শুধুই খোলা দরজার আহ্বান। আর কচিপাতার ও দূর্বাঘাসের শ্যামলিমায়, ফুলের হাসিতে ও পাখির গানে, সেই উন্মুক্ত অবকাশগুলি নিরন্তর পূর্ণ হয়ে উঠছে। —দক্ষিণের দরজার পাশেই ছোটো একটুকরো বাগান, সেখানে

শিউলি, গন্ধরাজ আর হাসনুহানার গাছ সৌরভ ছড়ায়, তার মাঝখানে একটি বসোরা গোলাপের চারা। একটি স্তবকে দুটি গোলাপ ফুল ফুটেছিল সেদিন, আমি দোর খুলেই থমকে দাঁড়ালাম, সকল সত্তা যেন আটকে গেল ওই স্তবকে, আমি দেখতেই লাগলাম, দেখা আর ফুরোয় না। —আমাদের আর ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাড়ির মাঝখানে যে নালাটি বাইরের খাল-নদীর জল বহন করে বর্ষার মরশুমে পুকুরে এনে ফেলে, সেখানে অনেক বড়ো বড়ো শিঙি, মাগুর মাছের আনাগোনা। বাবা প্রায়ই সেখানে ছিপ ফেলে বসেন। আমি অনেক সময় গিয়ে দাঁড়াই। পাশে একটি 'গনিয়ারি' গাছ ও একটি ঝুমকো জবার গাছ পাশাপাশি জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। ঝুমকো গাছটি রাশি রাশি লাল ফুলে ভরা। চোখ আকর্ষণ করে নেয় তাদের সুষমা, তাদের সোহাগ বন্ধন—রাধাকৃষ্ণ যেন। —বাড়ির চাকর আনন্দ যখন দেশে যায়, তখন প্রাতরাশের পর বাসনপত্র নিয়ে খিড়কির পুকুরঘাটে মাজতে যাই, আর দেখতে থাকি, পুকুরের শান্ত জল, রক্তশাপলা ও শ্বেতশাপলার ফুলে ফুলে কী অপূর্ব শোভায় সেজেছে। আয়নার মতো স্বচ্ছ তার জলরাশি, মুখ নীচু করে তাকিয়ে দেখি, শাপলার বৃন্তগুলি সাপের মতো এঁকেবেঁকে গভীর থেকে আরও গভীরে নেমে গেছে। কোন অতলে পৌঁছেছে? সে কি রূপবতী রাজকন্যার পাতালপুরীতে? নিজের মুখখানার প্রতিবিম্ব জলে ভেসে উঠল— চমকে ভাবলাম, এই কি সেই রাজকন্যা? শরীরে পুলক জাগে, মনে নেমে আসে স্বপ্নাবেশ।

পাইন দাঁড়িয়ে আকাশে নয়ন তুলি

হাইনরিখ্ হাইনে

উত্তরে বুনো নগ্ন পাহাড় 'পরে,
দাঁড়ায়ে পাইন আকাশে নয়ন তুলে,
যেন বরফের রূপালি কাপড় প'রে,
স্বপ্ন সে দেখে দিনরাত দুলে দুলে।

স্বপ্ন সে দেখে দূরে মরুভূমি প'রে
সেই দেশে যেথা প্রভাতে সূর্য ওঠে,
তপ্ত পাহাড়ে বেদনায় বুক ভ'রে
দাঁড়ায়ে রয়েছে পামগাছ মরুতটে।

অনুবাদ : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হাতেকলমে

হাইনরিখ্ হাইনে (১৭৯৭—১৮৫৬) : জন্ম জার্মানির রাইন নদীর তীরে ড্যুসেলডর্ফ-এ। উনবিংশ শতকের অন্যতম বিশিষ্ট জার্মান কবি। তিনি সাংবাদিকতার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। প্রাবন্ধিক এবং সাহিত্য সমালোচক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তবে গীতিকবি হিসেবেই তিনি বিশ্বজুড়ে সমাদৃত হয়েছেন। ১৮১৭ সালে প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৮২৬ সালে প্রকাশিত হয় *হার্ৎস্‌রাইজে* (*Harzreise*) বা *হার্ৎস যাত্রা*। ১৮২৭ সালে প্রকাশিত কাব্যগীতিগ্রন্থ (*Buch der Lieder*) *উত্তর সাগরগীতিকা* তাঁকে বিশ্বজনীন খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছিল। এ ছাড়াও *নতুন কবিতা*, *জার্মানি: এক শীতের রূপকথা* প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এবং *ফরাসি পরিস্থিতি*, *রোমান্টিক কাব্যধারা*, *ধর্মের ইতিহাস* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য আলোচনাগ্রন্থ। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তাঁর গীতিকবিতাগুলি অনূদিত হয়েছে।

১.১ কবি হাইনরিখ্ হাইনের জন্মস্থান কোথায়?

১.২ কবি হাইনে-র লেখা দুটি কবিতার বইয়ের নাম লেখো।

১.৩ কবি হাইনে-র লেখা দুটি গদ্যগ্রন্থের নাম লেখো।

২. ঠিক উত্তরের উপরে '✓' দাও:

২.১ (উত্তরে/দক্ষিণে/পশ্চিমে) বুনো নগ্ন পাহাড়ে পাইন দাঁড়িয়ে।

২.২ যেন বরফের (সোনালি/রূপালি/সবুজে) কাপড় পরে...।

২.৩ মরুতটে দাঁড়িয়ে রয়েছে (পাইন/পাম/খেজুর) গাছ।

২.৪ জার্মান ভাষায় কবিতা লেখেননি (গোয়ঠে/রিলকে/শেক্সপিয়র)।

৩. নীচের প্রশ্নগুলির দু-একটি বাক্যে উত্তর লেখো :

৩.১ পাইন গাছ সাধারণত কোন অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়?

৩.২ পাইন গাছ কী ধরনের পোশাক পরে আছে বলে কবির মনে হয়েছে?

৩.৩ পাম গাছ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে?

৩.৪ পাইন গাছ কীভাবে স্বপ্ন দেখে?

৪. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

৪.১ পাম গাছের বুক বেদনায় ভরা কেন?

৪.২ পাইন গাছ কী স্বপ্ন দেখে?

৪.৩ বরফের দেশের পাইনগাছ, মরুভূমির পাম গাছের স্বপ্ন দেখে কেন?

শব্দার্থ: নগ্ন পাহাড় — গাছপালাহীন (ন্যাড়া) পাহাড়। তপ্ত — গরম। বুনো — বন্য। প্রভাত — ভোরবেলা। বেদনা — ব্যথা, কষ্ট।

৫. **‘মরুভূমি’ ও ‘মরুতট’ শব্দ দুটি লক্ষ করো :**

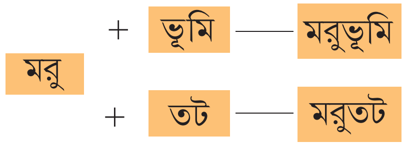

একইভাবে ‘সূর্য’ ও ‘নয়ন’-এর সঙ্গে একাধিক শব্দ যোগ করে নতুন শব্দ তৈরি করো।

৬. সমগ্র কবিতাটির মধ্যে কতগুলি বিশেষণ খুঁজে পাও লেখো।

৭. **নানারকম গাছের নাম লিখে নীচের ছকটি পূরণ করো:**

পার্বত্য অঞ্চল	মরুভূমি অঞ্চল
পাইন,	পাম,

৮. পার্বত্য অঞ্চল ও মরুভূমি অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি ফুটিয়ে তুলতে তুমি নীচের মানস মানচিত্রে কী কী শব্দ ব্যবহার করবে? তুমি এর মধ্যে যে কোনো একটিতে মানস অভিযানে গেলে কী কী জিনিস সঙ্গে নেবে? সেই অভিযানের কাল্পনিক বিবরণ কয়েকটি বাক্যে লেখো।

আকাশভরা সূর্য-তারা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।।
অসীম কালের যে হিল্লোলে   জোয়ার-ভাঁটায় ভুবন দোলে
নাড়িতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।।
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে,
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
কান পেতেছি, চোখ মেলেছি,   ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) : বাংলাভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার এবং সুরকার। তাঁর রচিত গানগুলি 'গীতিবিতান' নামের বইতে কয়েক খণ্ডে বিধৃত রয়েছে। আর গানগুলির স্বরলিপি বিভিন্ন খণ্ডে রয়েছে 'স্বরবিতান' নামের বইয়ে।

মন-ভালো-করা

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

মন-ভালো-করা রোদ্দুর কেন
মাছরাঙাটির গায়ের মতন?
হ্রস্ব দীর্ঘ নীল-নীলান্ত
কেন ওর রং খর ও শান্ত,
লাল হরিদ্রা সবুজাভ বন?
মন-ভালো-করা রোদ্দুর কেন
মাছরাঙাটির গায়ের মতন?
মাছরাঙাটির গায়ে আলো পড়ে
হাওয়ায়-বাতাসে পাতারাও নড়ে,
মাছরাঙাটির গায়ে হাওয়া পড়ে।
মন-ভালো-করা রোদ্দুর কেন
মাছরাঙাটির গায়ের মতন?

শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩—১৯৯৫) : বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কবি। জন্ম দক্ষিণ ২৪ পরগনার বহড়ু গ্রামে। পড়াশুনো করেছেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য*। এছাড়াও *ধর্মে আছি জিরাফেও আছি, হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান, সোনার মাছি খুন করেছি, যেতে পারি কিন্তু কেন যাব* উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। *কুয়োতলা, অবনী বাড়ি আছো?* বিখ্যাত উপন্যাস। তিনি *আনন্দ* পুরস্কার এবং *সাহিত্য অকাদেমি* পুরস্কার পেয়েছেন।

১.১ শক্তি চট্টোপাধ্যায় কোন কলেজের ছাত্র ছিলেন?

১.২ তাঁর রচিত দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

২. **নীচের শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লিখে তা দিয়ে বাক্যরচনা করো :** হ্রস্ব, খর, শান্ত।

৩. **নীচের শব্দগুলি কোন মূল শব্দ থেকে এসেছে লেখো :** রোদ্দুর, গা।

৪. 'হাওয়ায়-বাতাসে পাতারাও নড়ে' — হাওয়া-বাতাসের মতো একই অর্থবোধক পাঁচটি শব্দবন্ধ রচনা করে স্বাধীন বাক্যে প্রয়োগ করো।

৫. 'মন-ভালো-করা,' 'নীল-নীলান্ত'র মতো একাধিক শব্দবন্ধ তৈরি করো।

শব্দার্থ : হ্রস্ব — ছোটো, ক্ষুদ্র। হরিদ্রা — হলুদ। খর — তীব্র।

৬. **গদ্যে লেখো :**

'মন-ভালো-করা-রোদ্দুর কেন / মাছরাঙাটির গায়ের মতন?'

৭. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৭.১ কবিতায় কবিমনে কোন কোন প্রশ্ন জেগেছে তা নিজের ভাষায় লেখো।

৭.২ মন-ভালো-করা রোদ্দুরকে কবি কীসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

৭.৩ মাছরাঙা পাখির রং কবির চোখে কীভাবে ধরা পড়েছে?

৭.৪ গাছের ডালে বসা মাছরাঙা পাখিটি কীভাবে কবিকল্পনাকে প্রভাবিত করেছে তা বুঝিয়ে দাও।

মিলিয়ে পড়ো

মাছরাঙা পাখির কথা কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় পড়লে। এবার পড়ো মাছ খেতে ভালোবাসে যে 'মেনি', তার কথা।

মেনি

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

মেনিটাকে দেখছি না কই তো !
মাছ খায় হাঁড়ি থেকে লাভ নাই কিছু রেখে,
রাখা দায় ঘরে দুধ-দই তো !

সব বাড়ি সব ঠাঁই গতি যে,
নিত্য সবার করে ক্ষতি সে—
ছেলেদের বিছানায় আরামেতে ঘুম যায়
করে নাকো উৎপাত বই তো।

দোষ ছাড়া গুণ নাই বিন্দু,
তবু কী আকর্ষণ বুঝিতে পারে না মন,
ছেড়ে দিতে চায় নাকো কিন্তু।

চলে গেল গোটা দিন রাত রে,
আঁখি তারে ফিরিতেছে হাতড়ে,
কোথা গেল পথ ভুলো কাঁদিতেছে ছেলেগুলো,—
পৃথিবীর ঝঞ্ঝাট ওই তো।

পশুপাখির ভাষা

সুবিনয় রায়চৌধুরী

'পশুপাখির কি ভাষা আছে? তারা কি মনের ভাবগুলি বিশেষ বিশেষ শব্দ দিয়ে প্রকাশ করে? পরস্পরকে বুঝাবার জন্য তারা কি কোনো ভাষা ব্যবহার করে?' — এইসব প্রশ্ন মানুষের মনে বহুকাল থেকেই জেগেছে এবং এই বিষয়ে নানারকমের পরীক্ষা বহুকাল থেকে হয়ে আসছে।

পশুপাখিরা অবিশ্যি মানুষের অনেক কথারই অর্থ বোঝে। বুদ্ধিমান জীব — যেমন কুকুর, বনমানুষ, ঘোড়া প্রভৃতি — তাদের মানুষে-দেওয়া নাম শুনলেই কান খাড়া করে; — নাম ধরে ডাক দিলে কাছে আসে। মুরগিরা 'তি-তি' ডাক শুনে আসে, হাঁস 'সোই-সোই' ডাক শুনে আসে, ছাগল 'অ-র্-র্' ডাক শুনে আসে। হাতি তো মাহুতের কথা শুনেই চলে। মাহুতের ভাষায় (পূর্ববঙ্গের) 'বৈঠ' হচ্ছে 'বস', 'তেরে' মানে কাত হও, 'ভোরি' মানে 'পিছনে যাও', 'মাইল' মানে সাবধান ইত্যাদি। কুকুরেরাও কথা শুনে হুকুম পালন করতে ওস্তাদ;— অবিশ্যি, সে-সব কথার অর্থ তাদের শেখাতে হয়।

পশুরা মানুষের ভাষা কিছুকিছু বোঝে বটে; কিন্তু, সে ভাষা তো তারা বলতে পারে না; পরস্পরকেও সে ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়ার কোনো উপায় জানে না তারা। তাদের মুখের কয়েকটি বিশেষ শব্দ যে তাদের মনের ভাবকে প্রকাশ করে, সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। বেড়াল বা কুকুর ঝগড়া করার সময় যে শব্দ করে, কান্নার সময় সে শব্দ করে না। দূর থেকে শুনেই বোঝা যায় ঝগড়া করছে কী কাঁদছে। কুকুরের ঝগড়া আর রাগের শব্দে 'ঘেউ' আছে; ভয় বা কান্নার শব্দে 'কেঁউ' আছে। জাতভেদে শব্দের টানে আর গাম্ভীর্যে যা একটু তফাত। বেড়ালেরও তেমনি সাধারণ আওয়াজে 'ম্যাও', 'মিউ' ইত্যাদি আছে; রাগ বা ঝগড়ায় 'ওয়াও' আছে। দূর থেকে শব্দ শুনেই বোঝা যায় ঝগড়া করছে কী কাঁদছে। কী শুধু আওয়াজ

করছে— অর্থাৎ, তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছে। অনেক পশুই এই ধরনের শব্দ করে থাকে। পাখিরাও ভয়, রাগ প্রভৃতি প্রকাশ করবার জন্য বিশেষ বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করে থাকে। বিপদের সময় পরস্পরকে জানাবার উপায়ও পশুপাখিরা বেশ জানে।

রিউবেন ক্যাস্টাং নামে একজন সাহেব বহুকাল পশুদের সঙ্গে ভাব পাতিয়ে বেড়িয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি পশুর ভাষা বেশ বুঝি। কতবার আমি জংলি হাতির সামনে পড়েছি, বাঘের গরম নিশ্বাস অনুভব করেছি, প্রকাণ্ড ভাল্লুকের থাবা মুখের সামনে দেখেছি, গরিলা প্রায় জড়িয়ে ধরে ফেলেছে আমাকে। কিন্তু একটি জিনিস প্রত্যেকবারই আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে, — সেটি হচ্ছে, পশুদের ভাষার জ্ঞান। আমি পশুদের ভাষা কিছুকিছু জানি বলেই এতবার সাক্ষাৎ যমকে এড়িয়ে যেতে পেরেছি।'

তিনি আরও বলেন, 'সিংহকে যদি তারই ভাষায় বলতে পারো, তুমি তার বন্ধু, তাহলে অনেকটা নিরাপদ হবে। তারপর যদি তাদের জাতের আদবকায়দা অনুসারে তার কাছে যেতে পারো, তাহলে ভয়ের বিশেষ কোনো কারণ থাকবে না।'

ক্যাস্টাং সাহেব প্রায় চল্লিশ বছর বন্যজন্তুদের সঙ্গে থেকেছেন। খাঁচার এবং জঙ্গলের,— অর্থাৎ পোষা এবং বুনো এই দুই অবস্থার জন্তুদের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয়ের নানা সুযোগ ঘটেছে। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে বেশিরভাগই হচ্ছে শিম্পাঞ্জি, গরিলা, সিংহ, গ্রিজ্‌লি ভাল্লুক আর শ্বেত ভাল্লুক।

তিনি বলেন, 'এইসব পশুর গলার শব্দের অবিকল নকল করার ক্ষমতা থাকায় শুধু যে বহুবার আমার প্রাণ বেঁচেছে, তা নয়; এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবারও অনেক সুবিধা হয়েছে। পশুরা শুধু শব্দের

সাহায্যে কথা বলে না, নানারকম ইশারায়ও বলে। কুকুরের লেজনাড়া আর কান নাড়ার মধ্যে কত অর্থ আছে, তা অনেকেই আমরা জানি। একেও ভাষা বলতে হবে।'

পোষা জন্তুরা নাকি জঙ্গলের জন্তুদের থেকে অনেক বেশি চেঁচামেচি করে। পোষা কুকুর আর ঘোড়া কত চেঁচায়! কিন্তু জংলি কুকুর বা ঘোড়ার শব্দ বড়ো একটা শোনা যায় না। জঙ্গলের পশুকে সর্বদাই প্রাণ বাঁচিয়ে চলতে হয়, তাই তারা স্বভাবতই নীরব।

পশুর মধ্যে শিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং জাতীয় বনমানুষের ভাষা বিশেষ কিছু নাই। বানরের মধ্যে কয়েক জাতীয় বড়ো বানর ছাড়া অন্য সকলের ভাষার শব্দ অতি সামান্যই। ক্যাস্টাং সাহেব এইসব ভাষা নিয়ে বহু বৎসর গবেষণা করেছেন।

তিনি বলেন, ভালো করে লক্ষ করলে পশুদের মনের বিভিন্ন অবস্থার আওয়াজগুলি বেশ স্পষ্টভাবে ধরা যায়। এইসব আওয়াজের অবিকল নকল করতে শিখলে পশুদের সঙ্গে ভাব পাতাবারও সুবিধা হয়।

ক্যাস্টাং সাহেব বলেন, হাতি, সিংহ, বাঘ আর শ্বেত ভাল্লুকের কয়েকটির গায়ে হাত দেওয়ার আগে বিশেষ করে লক্ষ করতে হবে, তোমার আওয়াজের জবাব সে দিচ্ছে কিনা। তারপর, খুব সাবধানে, অত্যন্ত ধীরে এগিয়ে, মেজাজ বুঝে, তার গায়ে হাত দিতে হবে। বাঘের চেয়ে চিতা ঢের সহজে ভাব পাতায় আর পোষও মানে। তার মুখটি দেখলেই অনেকটা বেড়াল-বেড়াল ভাব মনে আসে।

ভাল্লুক নিরামিষাশী আর লোভী; তাকে খাবার দিলেই সে সহজে ভাব পাতায়। আমিষাশী জন্তু কিন্তু কখনও খাবারের লোভে ভাব করে না। খাবার সময় তার কারো সঙ্গে ভাব নাই; — তখন সকলকেই অবিশ্বাস।

শিম্পাঞ্জি, ওরাং এদের বিষয় কিছু লেখা হয়নি। এরা তো মানুষেরই জাতভাই; কিন্তু ভাষা এদের বড়ো একটা নাই। ভালোবাসা, সহানুভূতি প্রভৃতি এরা খুব বোঝে; ভাবও পাতায় সহজেই। এদের মনের ভাবই মুখে বেশি প্রকাশ পায়। গরিলাও এদের জাতভাই; সেও অনেকটা এদের মতো; তবে একটু কম চালাক।

হাতে কলমে

সুবিনয় রায়চৌধুরী (১৮৯০—১৯৪৫) : প্রখ্যাত সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুত্র। তিনি হারমোনিয়াম, এসরাজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র দক্ষতার সঙ্গে বাজাতে পারতেন। সংগীতে তাঁর জ্ঞান ছিল সুবিদিত। তিনি একান্তভাবে ছোটোদের জন্যই লিখেছেন। একদিকে সহজ-সরল ভাষায় মজাদার গল্প-কবিতা যেমন লিখেছেন অজস্র, ঠিক তেমনই শিশু-কিশোর মনের জিজ্ঞাসা মেটাতে প্রাঞ্জল ভাষায় তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধও রচনা করেছেন। *সন্দেশ* পত্রিকায় তাঁর বিপুল অবদান আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই *সুবিনয় রায়চৌধুরীর রচনা সংগ্রহ*।

১.১ সুবিনয় রায়চৌধুরী কী কী বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারতেন?

১.২ সুবিনয় রায়চৌধুরী কোন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?

২. কোনটি কার ডাক মিলিয়ে লেখো :

ব্যাঙের ডাক	কাকলি
হাতির ডাক	হ্রেষা
পাখির ডাক	বৃংহণ
কোকিলের ডাক	মকমকি
ঘোড়ার ডাক	কেকা
ময়ূরের ডাক	কুহু

শব্দার্থ : সাক্ষাৎ — প্রত্যক্ষ করা/দেখা হওয়া। আদবকায়দা — ভদ্রতার রীতিনীতি। নিরামিষাশী — নিরামিষ খাদ্য আহার করে যে। মাংসাশী — আমিষ খাদ্য আহার করে যে। সহানুভূতি — সমবেদনা।

৩. নীচের বিশেষ্য শব্দগুলিকে বিশেষণ এবং বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত করো :

পশু, মুখ, মন, পরীক্ষা, চালাক, অর্থ, লোভ, জন্তু, মেজাজ।

৪. বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ আলাদা করে দেখাও :

৪.১ মুরগিরা ‘তি-তি’ ডাক শুনে আসে।

৪.২ পাখিরাও ভয়, রাগ প্রভৃতি প্রকাশ করবার জন্য বিশেষ বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করে থাকে।

৪.৩ ক্যাস্টাং সাহেব প্রায় চল্লিশ বছর বন্য জন্তুদের সঙ্গে থেকেছেন।

৪.৪ শিম্পাঞ্জি, ওরাং এদের বিষয় কিছু লেখা হয়নি।

৫. **প্রতিশব্দ লেখো :** পাখি, পুকুর, হাতি, সিংহ, বাঘ।

৬. **নীচের যে শব্দগুলিতে এক বা বহু বোঝাচ্ছে, তা চিহ্নিত করে লেখো :**

৬.১ কুকুরেরাও কথা শুনে হুকুম পালন করতে ওস্তাদ।

৬.২ তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে।

৬.৩ বিপদের সময় পরস্পরকে জানাবার উপায়ও পশুপাখিরা বেশ জানে।

৬.৪ রিউবেন ক্যাস্টাং নামে একজন সাহেব বহুকাল পশুদের সঙ্গে ভাব পাতিয়ে বেড়িয়েছেন।

৬.৫ একেও ভাষা বলতে হবে।

৭. **নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :**

৭.১ ভাষার প্রয়োজন হয় কেন?

৭.২ ‘পশুপাখিরা অবিশ্যি মানুষের অনেক কথারই অর্থ বোঝে।’ —একথার সমর্থনে রচনাটিতে কোন কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে? তুমি এর সঙ্গে আর কী কী যোগ করতে চাইবে?

৭.৩ রিউবেন ক্যাস্টাং এর অভিজ্ঞতার কথা পাঠ্যাংশে কীভাবে স্থান পেয়েছে, তা আলোচনা করো।

৭.৪ ‘একেও ভাষা বলতে হবে।’ — কাকে ‘ভাষা’র মর্যাদা দিতে হবে বলে বক্তা মনে করেন? তুমি কি এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত? বুঝিয়ে লেখো।

৭.৫ ‘তাই তারা স্বভাবতই নীরব’ — কাদের কথা বলা হয়েছে? তাদের এই স্বভাবগত ‘নীরবতা’র কারণ কী?

৭.৬ ‘এরা তো মানুষেরই জাতভাই।’ — কাদের ‘মানুষের জাতভাই’ বলা হয়েছে? তা সত্ত্বেও মানুষের সঙ্গে তাদের কোন পার্থক্যের কথা পাঠ্যাংশে বলা হয়েছে, তা লেখো।

৭.৭ তোমার পরিবেশে থাকা জীবজন্তুর ডাক নিয়ে তুমি একটি অনুচ্ছেদ রচনা করো।

৭.৮ এমন একটি গল্প লেখো যেখানে পশুপাখিরা মানুষের সঙ্গে মানুষেরই মতো কথাবার্তা বলেছে আর তাদের মধ্যে অপরূপ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে।

৮. **পাশের ছবিটি দেখে নিজের ভাষায় পাঁচটি বাক্য লেখো :**

ঘাসফড়িং

অরুণ মিত্র

একটা ঘাসফড়িং-এর সঙ্গে আমার গলায় গলায় ভাব হয়েছে,
ভাব না করে পারতামই না আমরা।
ঝিরঝির বৃষ্টির পর আমি ভিজে ঘাসে পা দিয়েছি
অমনি শুরু হয়ে গেল আমাদের নতুন আত্মীয়তা।
সবুজ মাথা তুলে কত খেলা দেখাল ঘাসফড়িং,
তার কাছ থেকে চলে আসার সময় আমার কী মনখারাপ
বলে এলাম আমি আবার আসব,
আমার ঘরের দরজা এখন সবুজে সবুজ।

এই আবার ঝিরঝির বৃষ্টি
আমি কথা দিয়ে এসেছি
ভিজে ঘাসের ওপর আমাকে যেতেই হবে আবার।

হাতে কলমে

অরুণ মিত্র (১৯০৯ —২০০০) : জন্মস্থান বাংলাদেশের যশোহর জেলা। পিতা হীরালাল মিত্র, মাতা যামিনীবালা মিত্র। তিনি ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ। দীর্ঘকাল ফ্রান্সে ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হলো — *প্রান্তরেখা, ঘনিষ্ঠ তাপ, শুধু রাতের শব্দ নেই, খুঁজতে খুঁজতে এতদূর, শেষ সরাইখানা, ফরাসি সাহিত্য প্রসঙ্গে* ইত্যাদি। এছাড়া তিনি বহু প্রাচীন সাহিত্যের অনুবাদও করেছেন।

১.১ কবি অরুণ মিত্র কোন বিদেশি ভাষায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন?

১.২ তাঁর লেখা দুটি কবিতার বইয়ের নাম লেখো।

২. **বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ আলাদা করে দেখাও :**

২.১ ভাব না করে পারতামই না আমরা।

২.২ সবুজ মাথা তুলে কত খেলা দেখাল ঘাসফড়িং।

২.৩ আমার ঘরের দরজা এখন সবুজে সবুজ।

২.৪ ভিজে ঘাসের ওপর আমাকে যেতেই হবে আবার।

উদ্দেশ্য	বিধেয়

৩. **নীচের শব্দগুলি বাক্যে ব্যবহার করে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করো :**

ভাব, ভিজে, নতুন, আত্মীয়তা, মনখারাপ, সবুজ, ঝিরঝির।

এভাবে আমরা শুরু করতে পারি : খোলা মাঠের সঙ্গে আমার ভারি ভাব। বিশেষ করে তার উপরে গালচের মতো সবুজ ঘাস যখন ভিজে থাকে। যেন একটা নতুন পৃথিবীর মধ্যে দিয়ে আমি হেঁটে যাচ্ছি। ...

শব্দার্থ : আত্মীয়তা — কুটুম্বিতা। ঝিরঝির বৃষ্টি — মৃদু বৃষ্টিপাত। ভাব — বন্ধুত্ব।

৪. **নীচের বিশেষ্য শব্দগুলিকে বিশেষণে এবং বিশেষণ শব্দগুলিকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত করো :**

আত্মীয়তা, ঘাস, সবুজ, নতুন।

৫. **নির্দেশ অনুসারে বাক্য পরিবর্তন করো :**

৫.১ সবুজ মাথা তুলে কত খেলা দেখাল ঘাসফড়িং। (যৌগিক বাক্যে)

৫.২ একটা ঘাসফড়িং-এর সঙ্গে আমার গলায় গলায় ভাব হয়েছে। (জটিল বাক্যে)

৫.৩ যেই ঝিরঝির বৃষ্টি থেমেছে অমনি আমি ভিজে ঘাসে পা দিয়েছি। (সরল বাক্যে)

৫.৪ আমার ঘরের দরজা এখন সবুজে সবুজ। (যৌগিক বাক্যে)

৬. নীচের বাক্যগুলি থেকে শব্দবিভক্তি এবং অনুসর্গ খুঁজে নিয়ে লেখো :

৬.১ তার কাছ থেকে চলে আসার সময় আমার কী মনখারাপ।

৬.২ আমি কথা দিয়ে এসেছি।

৬.৩ ঝিরঝির বৃষ্টির পর আমি ভিজে ঘাসে পা দিয়েছি।

৬.৪ ভিজে ঘাসের ওপর আমাকে যেতেই হবে আবার।

৭. নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :

৭.১ কবির সঙ্গে ঘাসফড়িং-এর নতুন আত্মীয়তা কীভাবে গড়ে উঠল?

৭.২ কবির কৌতূহল ও ভালোলাগায় ঘাসফড়িং কীভাবে সাড়া দিল বলে তোমার মনে হয়?

৭.৩ ঘাস ফড়িং-এর কাছ থেকে চলে আসার সময় কবির মন খারাপ হলো কেন বুঝিয়ে দাও।

৭.৪ 'বলে এলাম আমি আবার আসব'— পঙ্‌ক্তিটির মধ্য দিয়ে কবির কোন মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে?

৭.৫ 'আমার ঘরের দরজা এখন সবুজে সবুজ।'— কবির এরূপ সবুজের সমারোহ দেখার কারণ কী?

৭.৬ 'ভিজে ঘাসের ওপর আমাকে যেতেই হবে আবার।'— কোন 'ভিজে ঘাসের ওপর' কবিকে ফিরতেই হবে? সেখানে তিনি যেতে চান কেন ?

৭.৭ প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার নিবিড় টান কীভাবে কবি অরুণ মিত্রের 'ঘাসফড়িং' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে, তা নিজের ভাষায় লেখো।

কুমোরে-পোকার বাসাবাড়ি

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

আমাদের দেশে ঘরের আনাচে-কানাচে বা দেয়ালের গায়ে লম্বাটে ধরনের এবড়ো-খেবড়ো এক-একটা শুকনো মাটির ডেলা লেগে থাকতে দেখা যায়। সেগুলি একপ্রকার কালো রঙের লিকলিকে কুমোরে-পোকার বাসা। এই পোকাগুলির গায়ের রং আগাগোড়া মিশমিশে কালো। কেবল শরীরের মধ্যস্থলের বোঁটার মতো সরু অংশটি হলদে। ডিম পাড়বার সময় হলেই এরা বাসা তৈরি করবার জন্য উপযুক্ত স্থান খুঁজতে বের হয়। দুই-চার দিন ঘুরে-ফিরে মনোমতো কোনো স্থান দেখতে পেলেই তার আশেপাশে বারবার ঘুরে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখে। তারপর খানিক দূর উড়ে গিয়ে আবার ফিরে আসে এবং স্থানটাকে পুনঃপুনঃ দেখে নেয়। দু-তিনবার এরূপভাবে এদিক-ওদিক উড়ে অবশেষে

কাদামাটির সন্ধানে বের হয়। যতটা সম্ভব নিকটবর্তী স্থানে কাদামাটি সন্ধান করতে সময় সময় দু-একদিন চলে যায়। কাদামাটির সন্ধান পেলেই বাসা নির্মাণের জন্য সেই স্থান থেকে নির্বাচিত স্থানে যাতায়াত করে রাস্তা চিনে নেয়। সাধারণত আশেপাশে চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ ব্যবধান থেকে মাটি সংগ্রহ করে থাকে। কিন্তু অত কাছাকাছি বাসা নির্মাণের উপযোগী মাটি না পেলে সময় সময় দেড়-দুশো গজ দূর থেকেও মাটি সংগ্রহ করে থাকে। কাছাকাছি কোনো স্থান থেকে মাটি সংগ্রহ করে বাসার একটা কুঠুরি নির্মাণ প্রায় শেষ করে এনেছে, এমন সময় সেই স্থানে কাদামাটি চাপা দিয়ে বা বাসাটা সরিয়ে ফেলে দেখেছি—সংস্কারবশেই হোক আর বুদ্ধি করেই হোক, কুমোরে-পোকাটা বাসার সন্ধান না পেয়ে কোনো একটা জলাশয়ের পাড়ে উড়ে গিয়ে সেখান থেকে ভিজা মাটি সংগ্রহ করে পূর্বের জায়গায় নতুন করে বাসা তৈরি শুরু করেছে। যতবারই এরূপ করেছি, ততবারই দেখেছি — পুকুর বা নালা, ডোবা যত দূরেই থাকুক না কেন, সেখান থেকেই ভিজা মাটি এনে বাসা তৈরি করেছে। এইসব অসুবিধার জন্য অবশ্য বাসা নির্মাণে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটে। একটি কুঠুরি তৈরি হয়ে গেলেই তার মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য, অর্থাৎ পোকামাকড় ভরতি করে তাতে একটি মাত্র ডিম পেড়ে মুখ বন্ধ করে তারই গা ঘেঁষে নতুন কুঠুরি নির্মাণ শুরু করে। কাজেই এ থেকে মনে হয় যে, কুমোরে-পোকা ইচ্ছামতো ডিম পাড়বার সময় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

বাসা নির্মাণের জন্য মাটি সংগ্রহ করবার সময় উড়ে গিয়ে ভিজা মাটির উপর বসে এবং লেজ নাচাতে নাচাতে এদিক-ওদিক ঘুরেফিরে দেখে। উপযুক্ত মনে হলেই সেখান থেকে ভিজা মাটি তুলে নিয়ে চোয়ালের সাহয্যে খুব ছোট্ট এক ডেলা মাটি মটরদানার মতো গোল করে মুখে করে উড়ে যায়। মাটি খুঁড়ে তোলবার সময় অতি তীক্ষ্ণ স্বরে একটানা গুনগুন শব্দ করতে থাকে। মুখ দিয়ে চেপে চেপে মাটির ডেলাটিকে দেয়ালের গায়ে অর্ধ-চক্রাকারে বসিয়ে দেয়। মাটির ডেলাটিকে লম্বা করে চেপে বসাবার সময়ও তীক্ষ্ণস্বরে একটানা গুনগুন শব্দ করতে থাকে। কোনো অদৃশ্য স্থানে বাসা বাঁধবার সময়ও এই গুনগুন শব্দ শুনেই বুঝতে পারা যায়, কুমোরে-পোকা বাসা বাঁধছে। পুকুর ধারে কাদামাটির উপর মাছির মতো একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা ঘুরে ঘুরে আহার সংগ্রহ করে। এরূপ স্থলে মাটি তোলবার সময় ওইরূপ কোনো পোকা তার কাছে এসে পড়লে মাটি তোলা বন্ধ রেখে তাকে ছুটে গিয়ে তাড়া করে। যাহোক, বারবার এরূপ এক-এক ডেলা মাটি এনে ভিতরের দিকে ফাঁকা রেখে ক্রমশ উপরের দিকে বাসা গেঁথে তুলতে থাকে। প্রায় সওয়া ইঞ্চি লম্বা হলেই গাঁথুনি ক্ষান্ত করে। এরূপ একটি কুঠুরি তৈরি করতে প্রায় দু-দিন সময় লেগে যায়। ইতিমধ্যে মাটি শুকিয়ে বাসা শক্ত হয়ে যায়। কুমোরে-পোকা তখন কুঠুরির ভিতরে প্রবেশ করে মুখ থেকে একপ্রকার লালা নিঃসৃত করে তার সাহায্যে কুঠুরির ভিতরের দেয়ালে প্রলেপ মাখিয়ে দেয়। প্রলেপ দেওয়া শেষ হলে শিকারের অন্বেষণে বের হয়। আমাদের দেশে বিভিন্ন জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাকড়সার অভাব নেই; তারা জাল বোনে না, ঘুরে ঘুরে শিকার ধরে। এই কুমোরে-পোকারা

বেছে বেছে এরূপ ভ্রমণকারী মাকড়সা শিকার করে থাকে। কোনোরকমে মাকড়সা একবার চোখে পড়লেই হলো, ছুটে গিয়ে তার ঘাড় কামড়ে ধরে। কিন্তু কামড়ে ধরলেও একেবারে মেরে ফেলে না। শরীরে হুল ফুটিয়ে একরকম বিষ ঢেলে দেয়। একবার হুল ফুটিয়ে নিরস্ত হয় না। কোনো কোনো মাকড়সাকে পাঁচ-সাতবার পর্যন্ত হুল ফুটিয়ে থাকে। এর ফলে মাকড়সাটার মৃত্যু হয় না বটে, কিন্তু একেবারে অসাড়ভাবে পড়ে থাকে। তখন কুমোরে-পোকা অসাড় মাকড়সাকে মুখে করে নবনির্মিত কুঠুরির মধ্যে উপস্থিত হয়। কুঠুরির নিম্নদেশে মাকড়সাটাকে চিত করে রেখে তার উদরদেশের এক পাশে লম্বাটে ধরনের একটি ডিম পাড়ে। ডিম পেড়েই আবার নতুন শিকারের সন্ধানে বের হয়। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে দশ-পনেরোটা মাকড়সা সংগ্রহ করে সেই কুঠুরির মধ্যে জমা করে আবার দু-তিন ডেলা মাটি এনে কুঠুরির মুখ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়। তারপর দু-এক দিনের মধ্যেই পূর্বোক্ত কুঠুরির গায়েই আর একটি কুঠুরি নির্মাণ শুরু করে। সেই কুঠুরিটিও মাকড়সা পূর্ণ করে তাতে ডিম পেড়ে মুখ বন্ধ করবার পর তৃতীয় কুঠুরি নির্মাণ করতে আরম্ভ করে। এরূপে এক একটি বাসার মধ্যে চার-পাঁচটি কুঠুরি নির্মিত হয়। ডিম পাড়া সম্পূর্ণ হয়ে গেলে সে তার ইচ্ছামতো যেকোনো স্থানে চলে যায়, বাসার আর কোনো খোঁজ-খবর নেয় না। বাচ্চাদের জন্যে খাদ্য সঞ্চিত রেখেই সে খালাস।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৯৫—১৯৮২) : প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সূত্রে তাঁর রচনার মূল উপাদান প্রকৃতি ও প্রাণীজগৎ। জীবজগতের খুঁটিনাটি তথ্য সহজ ভাব ও সরল ভাষায় তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। লেখক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুসন্ধিৎসা এবং পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলিকে বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদে পরিণত করেছে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার জন্য তিনি *রবীন্দ্র পুরস্কার* পেয়েছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হলো — *বাংলার মাকড়সা, বাংলার কীটপতঙ্গ* ইত্যাদি।

১.১ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বাংলা ভাষায় কী ধরনের লেখালিখির জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন?

১.২ তাঁর লেখা একটি বইয়ের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

২.১ কুমোরে-পোকার চেহারাটি কেমন?

২.২ কুমোরে-পোকা কী দিয়ে বাসা বানায়?

২.৩ কোনো অদৃশ্য স্থানে কুমোরে-পোকা বাসা বাঁধছে — তা কীভাবে বোঝা যায়?

২.৪ মাকড়সা দেখলেই কুমোরে-পোকা কী করে?

৩. **নীচের বিশেষ্য শব্দগুলিকে বিশেষণ এবং বিশেষণ শব্দগুলিকে বিশেষ্য করো :**
লম্বাটে, স্থান, নির্বাচিত, নির্মাণ, সঞ্চিত।

শব্দার্থ : আনাচে-কানাচে — কোনায় কোনায়। পুনঃপুনঃ — বারবার। সংস্কারবশে — প্রচলিত ধারণা বা বিশ্বাস অনুসারে। নিয়ন্ত্রণ — আয়ত্ত, পরিচালন। অর্ধ চক্রাকার — আধখানা চাকার আকারবিশিষ্ট। কুঠুরি — ছোটো ঘর বা প্রকোষ্ঠ। গাঁথুনি — পরপর স্থাপিত ইঁট, পাথর ইত্যাদির বিন্যাস। নিঃসৃত — নির্গত। প্রলেপ — লেপন করা হয় এমন বস্তু। নিম্নদেশে — নীচের অঞ্চলে। পূর্বোক্ত — আগে বলা হয়েছে এমন। সঞ্চিত — জমিয়ে রাখা হয়েছে এমন। খালাস — মুক্তি, রেহাই।

৪. **নীচের বাক্যগুলি থেকে অনুসর্গ খুঁজে বের করো :**

৪.১ বাসা তৈরির জন্য উপযুক্ত স্থান খুঁজতে বের হয়।

৪.২ সেই স্থান থেকে নির্বাচিত স্থানে যাতায়াত করে রাস্তা চিনে নেয়।

৪.৩ সেই স্থানে কাদামাটি চাপা দিয়ে দেখেছি।

৫. **উপযুক্ত প্রতিশব্দ পাঠ থেকে খুঁজে লেখো :** নির্মাণ, উপযোগী, ভর্তি, সন্ধান, ক্ষান্ত।

৬. তুমি প্রতিদিন পিঁপড়ে, মৌমাছি, মাকড়সা প্রভৃতি কীট-পতঙ্গ তোমার চারপাশে দেখতে পাও। তাদের মধ্যে কোনো একটিকে পর্যবেক্ষণ করো, আর তার চেহারা, স্বভাব, বাসা বানানোর কৌশল ইত্যাদি খাতায় লেখো।

কীট/পতঙ্গের নাম	
কোথায় দেখেছ	
চেহারা/গায়ের রং	
কীভাবে চলে	
কী খায়	
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	
বাসাটি দেখতে কেমন	
কীভাবে বানায়	

৭. গঠনগতভাবে কোনটি কী ধরনের বাক্য লেখো :

৭.১ ইতিমধ্যে মাটি শুকিয়ে বাসা শক্ত হয়ে গেছে।

৭.২ একবার হুল ফুটিয়ে নিরস্ত হয় না।

৭.৩ কাজেই এ থেকে মনে হয় যে, কুমোরে পোকা ইচ্ছামতো ডিম পাড়বার সময় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৭.৪ ভিজা মাটির উপর বসে এবং লেজ নাচাতে নাচাতে এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে দেখে।

৮. নীচের প্রশ্নগুলি নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :

৮.১ কুমোরে-পোকার বাসাবাড়িটি দেখতে কেমন?

৮.২ কুমোরে-পোকা বাসা বানানোর প্রস্তুতি কীভাবে নেয়?

৮.৩ কুমোরে-পোকার বাসা বানানোর প্রক্রিয়াটি নিজের ভাষায় লেখো।

৮.৪ ‘এইসব অসুবিধার জন্য অবশ্য বাসা নির্মাণে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটে।’— কোন অসুবিধাগুলির কথা এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে?

৮.৫ কুমোরে-পোকার শিকার ধরার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। শিকারকে সে কীভাবে সংগ্রহ করে?

৮.৬ ‘বাসার আর কোনো খোঁজ খবর নেয় না।’— কখন কুমোরে-পোকা তার বাসার আর কোনো খোঁজ খবর নেয় না?

মিলিয়ে পড়ো

কীট-পতঙ্গের প্রতি মানুষের নানা কোমল অনুভূতির কথা তোমরা ইতিমধ্যে পড়েছ। এবার আমাদের জাতীয় পাখি ময়ূরের সঙ্গে লেখিকার অন্তরঙ্গতার কথা পড়ে নাও।

আমার ময়ূর

প্রিয়ম্বদা দেবী

পাখি কে না ভালোবাসে, তাদের গান, তাদের চলাফেরা, সুন্দর ভঙ্গি কার না মন হরণ করে? বিশেষত তাদের যা আছে আমাদের তা নেই; তারা উড়তে পারে— পাখা মেলে দিয়ে আলো আর বাতাস সাগরে সাঁতার দিতে দিতে কোথায় চলে যায়—আমরা ঘরে বসে বসে দেখি, আমাদের মন উড়ু উড়ু করে, তবু গাছের মতো এক জায়গায় পোঁতা হয়ে আমরা আমাদের মনের ডালপালা নেড়েই মরি, চলতে পারিনে। তাই এই আকাশ বাতাসের সঙ্গী, বহু দেশদেশান্তরের সংবাদবহদের, আমাদের বড়ো রহস্যময় মনে হয়; তাদের সব খবর জানতে ইচ্ছে হয়।

খাঁচায় পুরে রাখলে তাদের উপর একটু অত্যাচার হয়, তাই আমি একবার একটি ময়ূর পুষেছিলাম। সেটি যখন প্রথমে এল তখন ছোট্ট কচি ময়ূরবাচ্ছা—ময়ূরছানা কী মুরগিছানা বোঝা কঠিন। কথায় বলে, ও যেন একটি ময়ূরছানা—তার মানে বাচ্ছা বয়সে কুশ্রী, ক্রমে সুন্দর হয়ে ওঠে। এরও তাই হলো—প্রথম যখন এল তখন না ছিল তার মাথার উপরে বঙ্কিম চূড়া, না ছিল তার চাঁদের টুকরো দিয়ে সাজানো, ছড়ানো বিচিত্র পুচ্ছ। গায়ের বর্ণ একেবারে মাটির মতো, শুকনো ঘাসের মতো।

ভালো করে খেতে পারত না, তাই তাকে হাতে করে খাইয়ে দিতে হতো। নিজের শক্তি নেই, তবু লোভটি পুরোপুরি ছিল—মুখে যতটা ধরে, খাবল দিয়ে তার চেয়ে বেশি মুখে পুরে, তারপর গিলবার সময়ই মুশকিল। তখন চোখ বুজে, ঘাড় বাঁকিয়ে, অনেক চেষ্টায় সেটি গলাধঃকরণ হতো, হওয়ামাত্র আর সে কষ্টের কথা মনে থাকত না, দ্বিতীয় গ্রাসটি নেওয়ার সময়ও ঠিক ওই ব্যাপার। তোমাদেরও বাপু কারও কারও ওই দোষ আছে — 'মুখে যতটা ধরে তার চেয়ে বেশি ভরে', বিষম খাবার জোগাড় করো; ওটা ভালো অভ্যাস নয়। দিব্যি পেট ভরে খেয়ে কিছুকালের জন্যে সে নড়াচড়া বন্ধ করে এক কোনায় পড়ে থাকত। চিংড়ি মাছ আর মোটা ভাত খেতেই সে বেশি ভালোবাসত, তার ফল, ধান চালের উপর তেমন আগ্রহ ছিল না।

খাবার যত্নে সে শিগগিরই বেশ বেড়ে উঠল। তখন তার সর্বাঙ্গে রং-এর লীলা দেখা দিল — মাথার চূড়াটি বেড়ে উঠে সোনালি সবুজে ভরে উঠল, বাতাসে সেটি যখন কাঁপত তখন সুন্দর দেখাত। গায়ের মাটির বর্ণ সোনালি সবুজে নীলে মিশিয়ে যাকে ধূপছায়া আর ময়ূরকণ্ঠী রং বলে, তাই হলো — একটু নড়াচড়া করলে নীল বিজলি আলোকশিখার মতো একটি কিরণ তার গায়ের উপর ঢেউ খেলিয়ে যেত। পুচ্ছটি যেমন বড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, তেমনি তাতে নীলকান্ত মণির খণ্ড খণ্ড চাঁদ দেখা দিল।

তার চেহারা যেমন চোখ ভুলানো, ধরনধারণ, গতিভঙ্গি, তেমন মন ভুলানো হলো। ভারি দুষ্টু; অতিশয় মিষ্টি। আমি সকালে যখন ভাঁড়ার দিতে, তরকারি কুটতে যেতাম, সেও আমার সঙ্গে সঙ্গে চলত। তার বরাদ্দ চাল ধান তার পছন্দ হতো না, আমার গোছানো জিনিস ঠুকরে চারিদিকে ছড়িয়ে দিত — দাসীরা যদি তাড়া দিত, তবে উলটে তাদের তাড়া করত। আমি বকলে কিংবা মারবার ভান করলে, দাঁড়িয়ে চোখ মিট মিট করত; হয়তো বা আরও দুষ্টু হয়ে বেশি করে ছড়িয়ে দিয়ে, পাখা ছড়িয়ে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াত—ভাবখানা যে, 'আমায় বুঝি মারবে? মারতে আর হয় না!' মারতে আর হতো নাই সত্যি, তার দুষ্টুমিষ্টি ভাব দেখে, তাকে কোলে টেনে নিতে ইচ্ছে করত — আমি শুধু হাসতাম। আহ্লাদ পেয়ে পেয়ে সে আদুরে ছেলের মতো আবদেরে হয়ে উঠেছিল — সমস্তক্ষণ পায়ে পায়ে ফিরত — কাজকর্মের সময় তার দিকে মন দিতে না পারলে কাপড় ধরে টানত। আমি যখন বসে বসে লিখতাম, আমার চৌকির হাতায় এসে বসত। তবু যদি তার দিকে না চেয়ে দেখতাম, তাহলে আমার হাতে ঠোকর দিত, এলোচুলের গুচ্ছ ধরে টানত— কাজেই অমনোযোগের ভান বেশিক্ষণ রক্ষা করা কঠিন হতো।

যখন সে ছোটো ছিল তখন তাকে রাত্রিবাসের জন্য একটি বড়ো ঝুড়ি দিয়ে ঢাকা দিয়ে ঘরের এক পাশে রাখা হতো, কিন্তু যত বড়ো হতে লাগল ততই এরকম আটক থাকতে আপত্তি দেখাতে আরম্ভ করল। তখন তাকে ছেড়ে রাখা হতো — সন্ধ্যার একটু আগেই ছাদের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গিয়ে, ছাদের পাশেই প্রকাণ্ড এক দেবদারু গাছে আশ্রয় নিত। সেখানেই রাত্রিযাপন করত। ভোর হলেই, তার সাড়া পাওয়া যেত, তখন আর সে ছাদের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসত না — পাখা মেলে মহানন্দে উড়ে

নেমে আসত। প্রথমে খানিকটা বাগানময় ডানা মেলে ছুটোছুটি করে বেড়াত। তারপর প্রাতরাশ সমাধা করে, মাটির উপর বুক দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে রোদ পোয়াতে খুব ভালোবাসত। দিনের মধ্যে খেলাধুলো লাফালাফি দুষ্টামির মাঝে মাঝে প্রায়ই এমনি নিস্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ থাকত।

নিজে স্বাধীনভাবে চলে ফিরে বেড়াত, তাই খাঁচায় পোরা পাখি সে আদপেই দেখতে ভালোবাসত না। আমার একটি কেনারি, একজোড়া চিনে টিয়া আছে আর একটি ময়না ছিল। ময়নাটি বড়ো সুন্দর, পাহাড়ি ময়না, সচরাচর ময়নার চেয়ে অনেক বড়ো— গলার স্বর গম্ভীর, বেশ স্পষ্ট কথা কইত। আমি তাকে ‘বন্দেমাতরম’ বলতে শেখাচ্ছিলাম—দু-ছত্র শিখেছিল। এমন মন দিয়ে শুনত যে অল্প সময়ের মধ্যেই শিখতে পারত। এই পাখিটিকে বন্ধ থাকা দেখতে ময়ূরের মোটেই ভালো লাগত না, দু-তিনবার তাকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল; কৃতকার্য হয়নি। পাহারা বড়ো কড়া ছিল। একদিন দুপুরে সবাই শুয়েছে,

আমি আমার ঘরে বসে পড়ছি— বারান্দায় একটা খুব ঝটাপটির শব্দ শুনতে পেলাম— আমি মনে করলাম ময়ূরচন্দ্র নৃত্য করছেন, একবার ভাবলাম উঠে দেখি, কিন্তু হাতের বইয়ে মন একেবারে ডুবে ছিল, ওঠা সহজ হলো না। কিছুক্ষণ পরে দাসীরা খেয়ে এসে বলল, ‘ওমা ময়না কোথায় গেল’ — ময়ূর তার খাঁচা খুলে তাকে বিদায় করে দিয়েছে—আকাশের পাখি খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে সেকি আর থাকে, কোথায় উধাও হয়ে গেল— আর ফিরে এল না।

যতদিন ময়ূর ছোটো ছিল, বাড়ির বাগানে বেড়িয়েই তার মন ভরত কিন্তু যত বড়ো হতে লাগল ততই চঞ্চলতা দেখা দিল— বাড়ি ছেড়ে প্রতিবেশীর ওখানে যেত, তারপর মালি গিয়ে তাকে খুঁজে খুঁজে বাড়ি আনত; অগত্যা দিন কতক পাখা বেঁধে রেখে দিতে হয়েছিল। বাড়িতেই থাকছে দেখে আবার খুলে দিলাম, একদিন ভোরে উঠে ময়ূরের আর দেখা নাই। আশা যখন একেবারে ছেড়ে দিয়েছি—বেলা প্রায় ১টা —এমন সময় একজন ময়ূর কোলে করে এসে উপস্থিত হলো। হারাধন পেয়ে ভারি আনন্দ হয়েছিল।

চিঠি

জসীমউদ্দিন

চিঠি পেলুম লাল মোরগের ভোর-জাগানোর সুর-ভরা
পাখার গায়ে শিশু উষার রঙন হাসি রঙিন করা।
চিঠি পেলুম চখাচখির বালুচরের ঝিকিমিকি,
ঢেউ-এ ঢেউ-এ বর্ষা সেথা লিখে গেছে কত কী কী!
লিখে গেছে গাঙশালিকে গাঙের পাড়ের মোড়ল হ'তে,
জল-ধারার কল কল ভাসিয়ে আসর উজান সোঁতে।

চিঠি পেলুম কিচিরমিচির বাবুই পাখির বাসার থেকে,
ধানের পাতায় তালের পাতায় বুনট-করা নকশা এঁকে।
চিঠি পেলুম কোড়াকুড়ীর বর্ষাকালের ফসল-ক্ষেতে,
সবুজ পাতার আসরগুলি নাচছে জল-ধারায় মেতে।
আকাশ জুড়ে মেঘের কাঁদন গুরু গুরু দেয়ার ডাকে,
উদাস বাতাস আছড়ে বলে কে যেন বা চাইছে কাকে।

ইহার সাথে পেলুম আজি খোকা ভাই-এর একটি চিঠি,
শীতের ভোরের রোদের মতো লেখনখানি লাগছে মিঠি।
দূর আকাশের সুনীল পাতায় পাখিরা সব ঝাঁকে ঝাঁকে
কত রকম ছড়ায় গড়ায়, মেঘের পাড়ায় পড়ায় কাকে।
সেই সে পড়া হরফ-করা খোকা ভাই-এর রঙিন হাতে
খুশির নূপুর ঝুমুর-ঝামুর বাজছে আমার নিরালাতে।

হাতেকলমে

জসীমউদ্দিন (১৯০৪ — ১৯৭৬) : জন্ম অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলা। কুমুদরঞ্জন মল্লিকের পরে গ্রাম-বাংলাকে কেন্দ্র করে কাব্যচর্চার ধারাটি তিনিই বজায় রেখেছিলেন। একান্ত সহজ সরল ভাষায় পল্লী প্রকৃতির অনাড়ম্বর রূপটিকে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। তাই বাংলা কাব্যজগতে 'পল্লী কবি' হিসেবে অভিহিত। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতার বইগুলি হলো *রাখালী*, *নক্সী কাঁথার মাঠ*, *বালুচর*, *সোজন বাদিয়ার ঘাট*, *মাটির কান্না* প্রভৃতি। তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সাম্মানিক ডি.লিট. প্রাপ্ত হন।

১.১ কবি জসীমউদ্দিনকে বাংলা কাব্য জগতে কোন অভিধায় অভিহিত করা হয়েছে?

১.২ তাঁর লেখা দুটি কবিতার বইয়ের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

২.১ কবি কার কার থেকে চিঠি পেয়েছেন?

২.২ লাল মোরগের পাঠানো চিঠিটি কেমন?

২.৩ চখাচখি কেমন চিঠি পাঠিয়েছে?

২.৪ গাঙশালিক তার চিঠিতে কী বলেছে?

২.৫ বাবুই পাখির বাসার থেকে আসা চিঠিটি কেমন?

২.৬ কোড়াকুড়ীর পাঠানো চিঠিটির বর্ণনা দাও।

২.৭ কার চিঠি পাওয়ায় কবির মনে হয়েছে নিখিল বিশ্ব তাঁকে চিঠি পাঠিয়েছে?

২.৮ এই কবিতায় কোন ঋতুর প্রসঙ্গ রয়েছে?

২.৯ কবিতায় অন্য ঋতুর পটভূমি সত্ত্বেও খোকাভাই-এর চিঠির লেখনখানি 'শীতের ভোরের রোদের মতো' মিঠে মনে হওয়ার তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।

২.১০ 'খুশির নূপুর ঝুমুর-ঝামুর বাজছে আমার নিরালাতে'— পঙ্‌ক্তিটির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

শব্দার্থ : চখাচখি — স্ত্রী ও পুরুষ চক্রবাক একত্রে, হাঁস জাতীয় পরিযায়ী পাখিবিশেষ। গাঙ — নদী। সোঁতে — স্রোতে (এই কবিতায়)। কোড়াকুড়ী — স্ত্রী ও পুরুষ জলচর পাখি একত্রে। দেয়া — মেঘ। নিরালা — নির্জন। ঊষা — ভোর।

৩. কবিতা থেকে এমন তিনটি শব্দ খুঁজে বের করো যা কোনও ধ্বনির অনুকরণে তৈরি। একটি উদাহরণ দেওয়া হলো। **যেমন :** কল কল।

৪. **শব্দঝুড়ি থেকে ঠিক শব্দ নিয়ে শূন্যস্থানে বসাও:**

	>	রঙিন
গঙগা	>	
	>	সোঁতে
ক্রন্দন	>	

শব্দঝুড়ি
স্রোতে, রঙিগন,
কাঁদন, গাঙ

৫. **'ঢেউ-এ ঢেউ-এ'** এখানে 'ঢেউ-এ' শব্দটি পরপর দু'বার ব্যবহার হওয়ায় অর্থ দাঁড়িয়েছে, 'অজস্র ঢেউ-এ'। অর্থাৎ একই শব্দ পরপর দু'বার ব্যবহারে বহু বচনের ভাব তৈরি হয়েছে। এই কবিতাটি থেকে আরও তিনটি অংশ উদ্ধৃত করো যেখানে এমন ঘটেছে।

৬. **'গাঙের পাড়ের মোড়ল'**— শব্দবন্ধটিতে পরপর দু'বার '-এর' সম্বন্ধ বিভক্তিটি এসেছে। কবিতা থেকে এমন আরও শব্দবন্ধ খুঁজে বের করো যেখানে পরপর দু'বার 'র' বা 'এর' বিভক্তি প্রয়োগে সম্বন্ধ পদ তৈরি হয়েছে।

৭. **'কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া'— পদক্রম অনুসারে নীচের বাক্যগুলিকে আবার লেখো :**

৭.১ লিখে গেছে গাঙশালিকে গাঙের পাড়ের মোড়ল হ'তে।

৭.২ ইহার সাথে পেলুম আজি খোকা ভাই-এর একটি চিঠি।

৭.৩ সবুজ পাতার আসরগুলি নাচছে জল-ধারায় মেতে।

৭.৪ উদাস বাতাস আছড়ে বলে কে যেন বা চাইছে কাকে।

৭.৫ শীতের ভোরের রোদের মতো লেখনখানি লাগছে মিঠি।

৮. **নীচের বাক্যগুলিকে ভেঙে দুটি বাক্যে পরিণত করো :**

৮.১ চিঠি পেলুম লাল মোরগের ভোর-জাগানোর সুরভরা।

৮.২ সবুজ পাতার আসরগুলি নাচছে জল-ধারায় মেতে।

৮.৩ শীতের ভোরের রোদের মতো লেখনখানি লাগছে মিঠি।

৮.৪ আকাশ জুড়ে মেঘের কাঁদন গুরু গুরু দেয়ার ডাকে।

৮.৫ লিখে গেছে গাঙশালিকে গাঙের পাড়ের মোড়ল হ'তে।

৯. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৯.১ কবি প্রকৃতির কোন-কোন প্রতিনিধির কাছ থেকে কেমন সমস্ত চিঠি পেয়েছিলেন, বিশদে লেখো।

৯.২ খোকা ভাই-এর চিঠিটির প্রসঙ্গে কবি যে সমস্ত উপমা ও তুলনাবাচক শব্দ ব্যবহার করেছেন তাদের ব্যবহারের সার্থকতা বুঝিয়ে দাও।

৯.৩ তোমার প্রিয় বন্ধুকে তোমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের ঘটনাটি জানিয়ে একটি চিঠি লেখো।

মরশুমের দিনে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ছোটো মফস্‌সল শহর। ডিপোয় বাস দাঁড়িয়ে। ধরাধরি করে ছাদে মাল তুলছে বাসের কনডাক্টর আর ক্লিনার। বাস যাবে দূরের শহরে কী গঞ্জে। সারা পথ সকলে যাবে না। গ্রামের যাত্রীরা নেমে নেমে যাবে মাঝরাস্তায়। কারও বা কোর্টে মামলা ছিল। কেউ বা এসেছিল সরকারি সেরেস্তায় হাকিমের কাছে দরবার করতে। কারও শক্ত রোগী আছে হাসপাতালে, দেখতে এসেছিল। কেউ এসেছিল দোকানের জন্য মাল তুলতে। ভিতরে নিজের নিজের জায়গায় হাতের জিনিস রেখে অনেকেই বাইরে এসে দাঁড়ায়। সামনেই চায়ের দোকানে বেঞ্চির ওপর বসে ড্রাইভার চা খায়। সেদিকে নজর রেখে যাত্রীর দল কাছেপিঠে ঘুরঘুর করে। গরমের সময় গায়ে হাওয়া লাগায়, শীতের সময় রোদ পোহায়।

বাসে ভিড় দেখতে হয় মাঠে ফসল উঠলে। মেয়ে দেখতে, পুজো দিতে লোকে এখানে সেখানে যায়। জিনিস কিনতে, সিনেমা দেখতে, মামলার তদবির-তদারক করতে শহরে যায়। উকিল-মোক্তার, বামুন-পুরুত, দরজি-দোকানি দুটো পয়সার মুখ দেখে। গ্রামের সঙ্গে শহরের যে এখনও নাড়ির টান, এই সময়টা তা বিলক্ষণ বোঝা যায়।

ধন বলতে ধান। কথাটা আজও সত্যি। ধানের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু বৃষ্টি। মাটি দেয় ফসল, আকাশ জল। ফসল আর জলবৃষ্টির কামনা করেই লোকের সারা বছর কাটে।

দেশি মতে আগে বছর শুরু হতো জলবৃষ্টি আর ফসলের সময় থেকে। মাসের নাম আর ঋতুর নামের মধ্যে আজও তার স্মৃতিচিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়।

আগে বছর আরম্ভ হতো অগ্রহায়ণে। হায়ন মানে বছর। অগ্রহায়ণ মানে বছরের গোড়া। হায়ন কথাটার আর এক মানে ফসল।

বছরকে আমরা বলি 'বর্ষ'। জলবৃষ্টির সময় এককালে বছর শুরু হতো বলে মরশুমের নাম হয়েছিল 'বর্ষ'। এদেশের যত পালা-পার্বণ, উৎসব-আনন্দ, সব কিছুরই মূলে রয়েছে চাষবাস।

শহর ছাড়ালেই দু-পাশে দেখা যাবে মাথার ওপর দরাজ আকাশ। বাস-রাস্তার দু-ধারে বটপাকুড় শাল সেগুনের গাছ। তার ডালে দৃষ্টি মাঝে মাঝে আটকে যাবে। কালো কুচকুচে বাঁধানো রাস্তা। মাঝে মাঝে বাঁক নিয়ে সোজা সামনে চলে গেছে।

গরমকালে চারদিকে হাওয়া যখন আগুনের মতো তেতে থাকে, তখন এই রাস্তার ওপরই এক ভারি মজার দৃশ্য দেখা যায়। যেতে যেতে মনে হয়, দূরে যেন জল চিকচিক করছে। আর সেই জলে উলটো হয়ে পড়েছে দু-পাশের গাছের ছায়া। কাছে যাও। কোথায় জল, কোথায় ছায়া! ঠিক মরুভূমির মরীচিকার মতো।

বাস রাস্তার ধারে ধারে মাঝে মাঝে লোকালয়। বড়ো গ্রাম হলে ইটের দালান দেখা যাবে। নইলে মাটির বাড়ি। খড় কিংবা টিনের চাল। লোকালয় পার হলেই আবার আদিগন্ত মাঠ। একেক ঋতুতে তার একেক চেহারা।

শরতে দেখবে যতদূর দৃষ্টি যায় নীলরঙের আকাশটাকে কেউ যেন ঝকঝকে তকতকে করে মেজে রেখেছে। মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই। রোদ যেন কাঁচা সোনার মতো। নীচে কোথাও মাটি দেখা যাচ্ছে না। সামনে পিছনে একটানা সবুজ ধান। সমুদ্রের মতো তার পার দেখা যায় না। তার ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে ঢেউ খেলে যায় হাওয়ায়। দূরে দূরে জেগে থাকে একটা দুটো তালখেজুর কিংবা শিশুপলাশ।

ধানকাটার পর একেবারে আলাদা দৃশ্য। যতদূর দৃষ্টি যায় রুক্ষ মাটি। শুকনো কঙ্কালসার চেহারা। আলগুলো জেগে থাকে বুকের হাড়পাঁজরের মতো। মাঠের ভিতর দিয়ে পায়ে পায়ে রাস্তা ফুটে ওঠে গ্রামে যাওয়ার। আকাশের রং তখন তামার হাঁড়ির মতো। রোদের দিকে তাকানো যায় না। গোরুর গাড়ির চাকায়, মানুষের পায়ে মাটির ডেলাগুলো ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ধুলো হয়। সেই ধুলো কখনও ঘূর্ণি হাওয়ায় কখনও দমকা হাওয়ায় উড়ে উড়ে দৃষ্টি আড়াল করে দাঁড়ায়। একটু বেলা হলেই মাটি তেতে

আগুন হয়ে ওঠে। যারা হালবলদ নিয়ে ভোরে মাঠে গিয়েছিল, বেলা বাড়লেই তারা যত তাড়াতাড়ি পারে ঘরে ফিরবে। নদী পুকুর খাল-বিল শুকিয়ে যায়। গাছে পাতা থাকে না। খাল-বিল নদী-নালার ধারে ধারে ছাড়া কোথাও ঘাসের ডগা দেখা যায় না। রাখালের দল ছড়ি-পাঁচন হাতে বটঅশথের ছায়ায় বসে থাকে। মাঝে মাঝে হাওয়ায় আগুনের হলকা দেয়। জলের জন্য চারিদিকে হাহাকার পড়ে যায়। লোকে সেইসময় ছায়া খুঁজে খুঁজে যাবে। পায়ে চলা রাস্তা যাবে বটঅশথের তলা দিয়ে, আমকাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায়। বাঁধানো ইঁদারা, নদীনালা, তালপুকুরের ধার দিয়ে দিয়ে। যেখানে হাতের কাছে পিপাসার জল পাওয়া যাবে।

আকাশের জল চেয়ে বসুধারা ব্রত করবার এই হলো সময়। কেন-না এখন :

কালবৈশাখী আগুন ঝরে!
কালবৈশাখী রোদে পোড়ে!
নদী শুকু শুকু, আকাশের ছাই!

কোথাও বা চাষির ঘরের বউরা করে ক্ষেত্রব্রত। তারা যায় বাড়ির কাছের খোলা জমিতে। নিজেরা ঘট প্রতিষ্ঠা করে তার গায়ে সিঁদুর-পুত্তলি এঁকে ঘটের জলে আমের পল্লব ডুবিয়ে দেয়। বুড়িদেরই

কেউ হয় মূলব্রতী। হাতে ফুল আর দূর্বা নিয়ে ব্রতীর দল তার মুখ থেকে শোনে ব্রতের কথা। সন্ধে নাগাদ উলু দিয়ে ব্রত শেষ হয়। তারপর মাঠে বসেই চিঁড়ে-গুড়-মুড়ি-খই আর দই দিয়ে ফলার খায়। ছেলেরাও ওইদিন ভোরে একজন কারো মাঠে গিয়ে জমিতে লাঙল দিয়ে বীজধান পুঁতে জমিতে জল ছড়িয়ে আসে।

কোথাও আছে বৃষ্টির অভাবে 'মেঘারানির কুলো' নামাবার প্রথা। কুলো, জল ঘট নিয়ে চাষিঘরের অল্পবয়সি মেয়েরা দলে দলে পাড়ায় বেরিয়ে পড়ে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গায়। গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি থেকে তারা পায় চাল-তেল-সিঁদুর, কখনও দু-চারটে পয়সা আর পান-সুপারি। দল বেঁধে তারা গায় :

হ্যাদে লো বুন মেঘারানি
হাত পাও ধুইয়া ফেলাও পানি।
ছোটো ভুঁইতে চিনচিনানি
বড়ো ভুঁইতে হাঁটুপানি।
মেঘারানির ঘরখানি পাথরের মাঝে
হেই বৃষ্টি নামে লো ঝাঁকে ঝাঁকে।
কালা মেঘা ধলা মেঘা বাড়ি আছনি?
গোলায় আছে বীজধান, বুনাইতে পারোনি?

মেঘকে নামাবার জন্য তারা নানা লোভ দেখায় :

কালো মেঘা নামো, ফুলতোলা মেঘা নামো
ধুলোট মেঘা, তুলোট মেঘা, তোমরা সবাই নামো।
কালো মেঘা টলমল, বার মেঘার ভাই
আরও ফুটিক জল দিলে ফুটিক চিনার খাই।
কালো মেঘা নামো নামো চোখের কাজল দিয়া
তোমার ভালে টিপ আঁকিব মোদের হলে বিয়া।
আড়িয়া মেঘা, হাড়িয়া মেঘা, কুড়িয়া মেঘার নাতি
নাকের নোলক বেচিয়া দিব তোমার মাথার ছাতি।
কৌটা ভরা সিঁদুর দিব সিঁদুর মেঘার গায়
আজকে যেন দেয়ার ডাকে মাঠ ডুবিয়া যায়।

কখনো-কখনো হঠাৎ বিকালের দিকে আকাশ কালো হয়ে আসে। ঝিম-ধরা আকাশে দেখা দেয় বেগবান মেঘ। মেঘের কোলে চমকাতে থাকে বিদ্যুৎ। তারপর নারকেল-তাল-খেজুর গাছের মাথাগুলোকে

হেলিয়ে দিয়ে নেমে আসে আচমকা ঝড়। জলের বড়ো বড়ো ফোঁটা তপ্ত মাটিতে পড়তে না পড়তে মিলিয়ে যায়। মেঘ যতই ডাকুক, যত গর্জায় তত বর্ষায় না। কখনো-কখনো শিলাবৃষ্টি হয়। মুহূর্তের মধ্যে জুড়িয়ে যায় গ্রীষ্মের তাপ। ছেলেরা হই হই করে ছোটে আমবাগানে। অন্ধকার হলে সঙ্গে হারিকেন নেয়। সুর করে করে বলে :

ঝড় ঝড় ঝড়
একটি আম পড়।
একটি আম পড়িসনে কো
তলা বিছিয়ে পড়।
খুকু খাবে পেট ভরে
নিয়ে যাবে ঘর।।

হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যায় মেঘ। বৃষ্টি আসি আসি করেও আসে না। আকাশ আগের অবস্থায় আবার ফিরে যায়। তবু বর্ষায় মরশুমের জন্য এখনই তৈরি হতে হয়। সারা গ্রামে চলে বর্ষার প্রস্তুতি।

হঠাৎ একদিন ঝমঝম করে পড়ে বৃষ্টি। গরম মাটিতে জল পড়ে ভাপ ওঠে। চাষিদের মুখে হাসি ফোটে। ছোটো ছোটো ছেলেরা আনন্দে দুলে দুলে ছড়া বলে : 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে।' ছোকরার দল দাওয়া থেকে উঠোনে নেমে প্রথম বৃষ্টিতে হই হই করে ভেজে। মাটির সোঁদা গন্ধে চারদিক ভরে ওঠে। বৃষ্টির ঝমঝম শব্দে অন্য সমস্ত আওয়াজ ডুবে যায়। বৃষ্টির ছন্দে ছেলেরা ছড়ার ঝুলি উপুড় করে দেয়। সুর করে করে বলে :

ওপারেতে কালো রং
বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম।
এ পারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুকটুক করে—
গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে।

তারপর ক-দিন সমানে বৃষ্টি। হোগলার তৈরি মাথালে মাথা পিঠ ঢেকে দুরন্ত জলের মধ্যেই গামছা পরে চাষিরা বেরিয়ে পড়ে মাঠের কাজে। ধান রোয়া, আল বাঁধার কাজ এখনই সেরে ফেলতে হবে। ধান ছাড়াও কারো আছে পাটের জমি। তারও বিস্তর কাজ।

গ্রামদেশে বনে বনে ফুল ফুটিয়ে বসন্ত কবে আসে কবে যায় ভালো করে ঠাহরই পাওয়া যায় না দক্ষিণের হাওয়াই শুধু বসন্তকে মনে পড়িয়ে দেয়। কিন্তু বর্ষা নামলে একবার শুধু বাইরে এসে দাঁড়াও যেখানে ঘাসের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না, হঠাৎ চোখে পড়বে সেখানে যেন কে সবুজ জাজিম পেতে রেখেছে। জমিতে ধান ডিগডিগ করে বেড়ে ওঠে। মাঝে মাঝে নিড়িয়ে দিতে হয় মাঠ। কিছু দিনের মধ্যেই ফুরিয়ে যায় মাঠের কাজ। তখন শুধু ফসলের অপেক্ষায় বসে থাকা।

বর্ষার শেষাশেষি মেয়েরা করে ভাদুলি ব্রত। মাটিতে আঁকে আলপনা : সাত সমুদ্র। তেরো নদী। নদীর চড়া। কাঁটার পর্বত। বন। ভেলা। বাঘ। মোষ। কাক। বক। তালগাছে বাবুইয়ের বাসা।— এ ব্রত সেইদিনের কথা মনে করিয়ে দেয়, যখন এদেশে সওদাগররা সাতডিঙা ভাসিয়ে সমুদ্রে বাণিজ্যে যেত। ব্রতের ছড়ায় আজও সে ছবি ধরা আছে। 'বাপ গেছেন বাণিজ্যে, ভাই গেছেন বাণিজ্যে, সোয়ামি গেছেন বাণিজ্যে' — তারা যেন নিরাপদে ফিরে আসে। ভাদ্রের ভরা নদীকে ডেকে দুরুদুরু বক্ষে তারা ব্যগ্রতা জানায় :

নদী! নদী! কোথায় যাও
বাপ ভাইয়ের বার্তা দাও।
নদী! নদী! কোথায় যাও
স্বামী-শ্বশুরের বার্তা দাও।

আজ সেই সওদাগরও নেই, সেই বাণিজ্যও নেই। কিন্তু এই ব্রতের ভিতর দিয়ে মনে পড়ে যায় সেই আপনজনদের কথা, যারা দূরে আছে।

হাতেকলমে

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯—২০০৩) : বাংলা কবিতায় এক উল্লেখযোগ্য নাম কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *পদাতিক* প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে *অগ্নিকোণ, চিরকুট, ফুল ফুটুক, যত দূরেই যাই, কাল মধুমাস, ছেলে গেছে বনে, জল সইতে,* প্রভৃতি। তিনি *হাফিজ, নাজিম হিকমত* ও *পাবলো নেরুদার* কবিতা অনুবাদ করেছেন। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি *জ্ঞানপীঠ* পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর গদ্য রচনার দৃষ্টান্ত *কাঁচা-পাকা, ঢোল গোবিন্দের আত্মদর্শন* প্রভৃতি গ্রন্থে ছড়িয়ে রয়েছে। পাঠ্য রচনাংশটি তাঁর *নারদের ডায়েরি* নামক বইয়ের *মরশুমের দিনে* রচনার অংশবিশেষ।

১.১ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা প্রথম কাব্যগ্রন্থটির নাম কী?

১.২ তাঁর লেখা একটি গদ্যের বইয়ের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ ধান শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?

২.২ ‘অগ্রহায়ণ’ বলতে কী বোঝায়?

২.৩ এদেশের সমস্ত পালা-পার্বণ, আনন্দ-উৎসব — এসবের মূলে কী রয়েছে?

২.৪ বসুধারা ব্রত কোন ঋতুতে হয়?

২.৫ মেঘকে নামাবার জন্য মেয়েরা দল বেঁধে ছড়া করে তাকে কী কী নামে ডাকে?

৩. **নীচের বিশেষ্য শব্দগুলিকে বিশেষণ এবং বিশেষণ শব্দগুলিকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত করো :**

মফস্বল, বৎসর, খর, ব্রত, বিস্তর, পর্বত, ঝড়।

৪. **নীচের বাক্যগুলি গঠনগতভাবে কোনটি কী ধরনের লেখো (সরল/ যৌগিক/জটিল) :**

৪.১ গ্রামের যাত্রীরা নেমে নেমে যাবে মাঝরাস্তায়।

৪.২ যেখানে ঘাসের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না, হঠাৎ চোখে পড়বে সেখানে যেন কে সবুজ জাজিম পেতে রেখেছে।

৪.৩ আয়বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে।

৪.৪ খড় কিংবা টিনের চাল।

৫. নীচের বাক্যগুলি থেকে শব্দবিভক্তি এবং অনুসর্গ খুঁজে নিয়ে লেখো :

৫.১ কেউ এসেছিল দোকানের জন্য মাল তুলতে।

৫.২ বৃষ্টির ঝমঝম শব্দে অন্য সমস্ত আওয়াজ ডুবে যায়।

৫.৩ সন্ধে নাগাদ উলু দিয়ে ব্রত শেষ হয়।

৫.৪ ছেলেরা হই হই করে ছোটে আমবাগানে।

৬. পাঠ থেকে নিম্নলিখিত শব্দগুলির সমার্থক শব্দ খুঁজে লেখো :

অম্বর, ধরা, মৃত্তিকা, প্রান্তর, তটিনী।

৭. নীচের সমোচ্চারিত/প্রায়- সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দগুলির অর্থ লেখো :

ধোয়া—	জলে—	বাধা —	গায়ে —	ঝরে —
ধোঁয়া—	জ্বলে—	বাঁধা —	গাঁয়ে —	ঝড়ে —

শব্দার্থ : মফস্‌সল — শহর বা নগরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোটো, সমৃদ্ধ জনপদ। ডিপো — আড়ত। সেরেস্তা — কার্যালয়, দফতর। তদবির-তদারক — দেখাশুনা, পরিচালনা করা। বিলক্ষণ — নিশ্চিত। পালাপার্বণ — বিভিন্ন উৎসব। দরাজ — মুক্ত, খোলা। লোকালয় — জনপদ। আদিগন্ত — আকাশের সীমান্তরেখা পর্যন্ত ব্যাপ্ত। আল — ক্ষেতের সীমারেখা নির্দিষ্ট করার জন্য বাঁধ। মাথাল — টোকা, ঘাসপাতা দিয়ে তৈরি ছাতাবিশেষ। ভাদুলি ব্রত — বাংলার লৌকিক দেবী ভাদুর নামে ভাদ্র মাসে যে ব্রত হয়। ব্যগ্রতা — ব্যাকুলতা।

৮. শুদ্ধ বানানটিতে '✓' চিহ্ন দাও

৮.১ মুহুর্ত/মূহুর্ত/মুহূর্ত

৮.২ অঘ্রহায়ন/অগ্রহায়ন/অগ্রহায়ণ

৮.৩ বিলক্ষণ/বিলক্ষন/বিলখ্যন

৮.৪ মরিচিকা/মরীচিকা/মরীচীকা

৯. বেলা, ডাল, সারা, চাল— এই শব্দগুলিকে দুটি পৃথক অর্থে ব্যবহার করে দুটি করে বাক্য লেখো।

১০. টীকা লেখো : মরীচিকা, বসুধারা, ব্রত, মেঘরানীর কুলো, ভাদুলি।

১১. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

১১.১ বাস-ডিপোয় অপেক্ষমান যাত্রীদের ছবি কীভাবে পাঠ্যাংশে ধরা পড়েছে।

১১.২ 'গ্রামের সঙ্গে শহরের যে এখনও নাড়ির টান' — এই নাড়ির টানের প্রসঙ্গ রচনাংশে কীভাবে এসেছে?

১১.৩ 'ধানের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু বৃষ্টি' — বৃষ্টির সময়ে ধানক্ষেতের ছবিটি কেমন? অন্য যে যে সময়ে ধান চাষ হয়ে থাকে, তা লেখো।

১১.৪ 'আগে বছর আরম্ভ হতো অগ্রহায়ণে' — এর সম্ভাব্য কারণ কী?

১১.৫ 'এদেশের যত পালা-পার্বণ, উৎসব-আনন্দ, সব কিছুরই মূলে রয়েছে চাষবাস।' — বাংলার উৎসব—খাদ্য—সংস্কৃতির সঙ্গে চাষবাস কতটা জড়িত বলে তুমি মনে করো?

১১.৬ 'শহর ছাড়ালেই দু-পাশে দেখা যাবে' — শহরের চিত্রটি কেমন? তা ছাড়িয়ে গেলে কোন দৃশ্য দেখা যাবে?

১১.৭ 'এই রাস্তার ওপরই এক ভারি মজার দৃশ্য দেখা যায়' — মজার দৃশ্যটি কেমন তা নিজের ভাষায় লেখো।

১১.৮ 'ব্রতের ভিতর দিয়ে মনে পড়ে যায় সেই আপনজনদের কথা, যারা দূরে আছে' — শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নিয়ে এমনই কিছু 'ব্রত'র ছড়া খাতায় সংগ্রহ করো।

১১.৯ বিভিন্ন ঋতুবিষয়ক প্রচলিত ছড়া আর ছবি সাজিয়ে নিজেরা লিখে বিদ্যালয়ে একটি দেয়াল-পত্রিকা তৈরি করো।

১১.১০ 'ধান কাটার পর একেবারে আলাদা দৃশ্য' — এই দৃশ্যে কোন ঋতুর ছবি ফুটে উঠেছে? সেই ঋতু সম্পর্কে কয়েকটি বাক্যে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করো।

মিলিয়ে পড়ো

'মরশুমের দিনগুলি' পড়ে তোমরা গ্রামবাংলার মাঠঘাট, ব্রতকথা সম্পর্কে জেনেছ। এরই সঙ্গে জেনে নাও নবাবি আমলের মুর্শিদাবাদের জনপ্রিয় আরও একটি উৎসবের কথা।

খোজা খিজির উৎসব

বিনয় ঘোষ

ভোরবেলা এবং মধ্যরাতে নবাবপ্রাসাদের থেকে বাদ্যসংগীতের সুর ভেসে আসে কানে। অতীতের নবাবি আভিজাত্যের রেশ এই সুরের মধ্যে অনুরণিত হয়ে ওঠে।

নাগরা, ঢোল কাড়ানাকাড়া সহযোগে শিঙা সানাই ইত্যাদি সুরের মিশ্রণ একটা করুণ বিষণ্ণ রাগিণীতে ধ্বনিত হয়ে বাতাসে তরঙ্গায়িত হতে থাকে। সেই সুরতরঙ্গে অতীতের নবাবি আমলের স্মৃতি ভাগীরথীর বুকে জেগে উঠে আবার ভাগীরথীর বুকেই বিলীন হয়ে যায়।

নবাবপ্রাসাদের এই সুরের মতো মুর্শিদাবাদের দু-একটি উৎসব আছে যা আজও নবাবি আমলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এরকম একটি উৎসব হলো 'খোজা খিজির' বা বেরা উৎসব। বেরা উৎসব ভাদ্রমাসে অনুষ্ঠিত হয়। ভাদ্রে ভরা নদী ভাগীরথী উৎসবের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ। এই জলময় প্রাঙ্গণ আলোর ভেলায় ও ছোটোবড়ো জলযানে আলোকময় হয়ে ওঠে। ভেলা ও জলযান নির্মাণ এবং তাদের রূপসজ্জার

কাজ উৎসবের অনেক আগে থেকেই কারুশিল্পীরা করতে থাকেন। মুর্শিদাবাদ নগরের কাছে জাফরগঞ্জ একটি বড় নির্মাণকেন্দ্র। বাঁশ ও কলাগাছ নির্মাণের প্রধান উপাদান। গ্রামাঞ্চল থেকে এই সব উপাদান সংগ্রহ করা হয়। বাঁশ থেকে জাফরি, ছেঁচা, চালি প্রভৃতি তৈরি করা হয়।

নবাবি আমল থেকে একশ্রেণির দক্ষ কারিগর এই ভেলা ও জলযান নির্মাণের কাজ বংশানুক্রমে করে আসছেন। সেকালের মহরম ও খোজা খিজির উৎসব উপলক্ষে কুশলী শিল্পীদের নিয়োগ করা হতো, অভ্রের পাত দিয়ে তৈরি আলো চিত্রিত করার জন্য। এই সমস্ত অভ্রের তৈরি আলোকে কোরানের বাণী, মসজিদ, গাছপালা ও নানারকমের মূর্তি চিত্রিত করার প্রথা ছিল। চিত্রণের কাজে শত-শত শিল্পী নিযুক্ত হতেন। ভেলা ও জলযানগুলিকে বহুবর্ণের দীপালোকে সাজানো বেশ উচ্চাঙ্গ শিল্পীদের কাজ ছিল। কলাগাছ জলে ভাসিয়ে তার উপর বাঁশ-বাঁখারি-ছেঁচা-চাটাই দিয়ে মিনার তোরণ গম্বুজ নিশান দুর্গ ইত্যাদির কাঠামো তৈরি করে সাজানো হয়। কতকগুলি জলযান দ্বিতল-ত্রিতল রণতরীর মতো করা হতো। নানারকম রঙিন কাগজ অভ্র রাংতা ইত্যাদি দিয়ে জলযানগুলিকে মুড়ে দেওয়া হতো। রুপালি আচ্ছাদনে আবৃত কৃত্রিম ঝাড়লন্ঠন জলযানে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। ধীরে-ধীরে উৎসবের বিশেষ দিনটি যত এগিয়ে আসত তত লোকের ঔৎসুক্য বাড়তে থাকত, কবে ভাদ্রের শেষ বৃহস্পতিবার আসবে এবং ভাগীরথীর ভরাবুক আলোয় আলোকিত হয়ে উঠবে।

হাজারদুয়ারি প্রাসাদের সামনে তোপখানার ঘাটে নবাববাড়ির উত্তরে প্রায় মাইল দুই দূরে মহীনগরের নীচে ভাগীরথীর জলে ভেলা সাজিয়ে রাখা হতো। তোপখানা থেকে কামান দাগার সঙ্গে সঙ্গে বেরার ভেলা ভাসানোর সময় ঘোষিত হতো। লালবাগ থেকে মহীনগর পর্যন্ত গঙ্গার তীর আলোয় আলোকময় হয়ে কি অপূর্ব দৃশ্য রচনা করত নবাবি আমলে, তা আজকের উৎসবের দৃশ্য দেখেও কল্পনা করা যায়।

তোপখানা থেকে কামানদাগা হলে ভেলার দড়ির বাঁধন কেটে দেওয়া হয়। নৌবহরের মতো ভাগীরথীর তরঙ্গভঙ্গে ভেসে যেতে থাকে। এইসময় মতিমহল থেকে বেশ বড় একটি জৌলুসের অনুগামী হয় সুসজ্জিত হাতি ঘোড়া উট অশ্বারোহী ও পদাতিক। জলযানগুলিও মন্থর গতিতে চলতে থাকে এবং তার তালে তালে বাজনা বাজতে থাকে। সেকালের সদাগরি ডিঙ্গার মতো কয়েকটি মকরমুখো নৌকাও দেখা যায়, তার উপরে চারচালা বাংলো।

জলদেবতা খাজা খিজিরের স্মরণোৎসব এই বেরা উৎসব বা ভেলা-ভাসান পরব। বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে এই উৎসবের উৎপত্তি হয়নি, মোগল আমলেই হয়েছে, কারণ রাজধানী ঢাকাতেও এই উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হতো। বাঙালি হিন্দু সদাগরদের বাণিজ্যযাত্রার নানান রকমের উৎসব-অনুষ্ঠানের বিবরণ মধ্যযুগের সাহিত্যে আছে। বাংলার মন্দিরের পোড়ামাটির ভাস্কর্যেও তার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই হিন্দু উৎসবের সঙ্গে বেরা উৎসব মিলিত হয়ে, নবাবদের পোষকতায়, এক অভিনব রূপ ধারণ করেছে, বিশেষ করে বাদ্য চিত্র ও আতসবাজির সংমিশ্রণে । বাংলার কুশলী মুসলমান লোকশিল্পীদের দান এই উৎসবে স্মরণীয়, এবং তাঁদের অভাব ছিল না মুর্শিদাবাদে।

হাট

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

দূরে দূরে গ্রাম দশবারোখানি,
মাঝে একখানি হাট,
সন্ধ্যায় সেথা জ্বলে না প্রদীপ
প্রভাতে পড়ে না ঝাঁট।
বেচা-কেনা সেরে বিকালবেলায়
যে যাহার সবে ঘরে ফিরে যায়;
বকের পাখায় আলোক লুকায়
ছাড়িয়া পুবের মাঠ;
দূরে দূরে গ্রামে জ্বলে ওঠে দীপ—
আঁধারেতে থাকে হাট।

নিশা নামে দূরে শ্রেণিহারা একা
ক্লান্ত কাকের পাখে;
নদীর বাতাস ছাড়ে প্রশ্বাস,
পার্শ্বে পাকুড় শাখে।
হাটের দোচালা মুদিল নয়ান,
কারো তরে তার নাই আহ্বান;
বাজে বায়ু আসি' বিদ্রুপ-বাঁশি
জীর্ণ বাঁশের ফাঁকে;
নির্জন হাটে রাত্রি নামিল
একক কাকের ডাকে।

দিবসেতে সেথা কত কোলাহল
চেনা-অচেনার ভিড়ে;
কত না ছিন্ন চরণচিহ্ন
ছড়ানো সে ঠাঁই ঘিরে।
মাল চেনাচিনি, দর জানাজানি,
কানাকড়ি নিয়ে কত টানাটানি;
হানাহানি করে কেউ নিল ভ'রে,
কেউ গেল খালি ফিরে।
দিবসে থাকে না কথার অন্ত
চেনা-অচেনার ভিড়ে।

কত কে আসিল, কত বা আসিছে,
কত না আসিবে হেথা;
ওপারের লোক নামালে পসরা
ছুটে এপারের ক্রেতা।
শিশির-বিমল প্রভাতের ফল,
শত হাতে সহি পরখের ছল —
বিকালবেলায় বিকায় হেলায়
সহিয়া নীরব ব্যথা।
হিসাব নাহি রে — এল আর গেল
কত ক্রেতা বিক্রেতা।

নূতন করিয়া বসা আর ভাঙা
পুরোনো হাটের মেলা;
দিবসরাত্রি নূতন যাত্রী
নিত্য নাটের খেলা।
খোলা আছে হাট মুক্ত বাতাসে,
বাধা নাই ওগো—যে যায় যে আসে,
কেহ কাঁদে, কেহ গাঁটে কড়ি বাঁধে
ঘরে ফিরিবার বেলা
উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে
চিরকাল একই খেলা।।

হাতেকলমে

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) : জন্মস্থান শান্তিপুরের হরিপুর গ্রাম। পেশায় ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। রবীন্দ্র সমসময়ে যে সমস্ত কবি স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে পেরেছিলেন কবি যতীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। *কল্লোল* গোষ্ঠীর জনপ্রিয় কবিদের মধ্যে তিনি একজন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য *মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়া, ত্রিযামা, সায়ম্, নিশান্তিকা* প্রভৃতি। বাংলা কাব্যজগতে তিনি *দুঃখবাদী* কবি অভিধা পেয়েছিলেন।

১.১ কোন সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল?

১.২ তাঁর রচিত দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

২. **নীচের বাক্যগুলি থেকে এমন শব্দ খুঁজে বের করো যার প্রতিশব্দ কবিতার মধ্যে আছে। কবিতার সেই শব্দটি পাশে লেখো :**

২.১ 'আঁধার-সাঁঝে বনের মাঝে উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছে।'

২.২ 'আলো, আমার আলো, ওগো আলো ভুবন-ভরা।'

২.৩ 'তুমি আমার সকালবেলার সুর।'

২.৪ 'আমার রাত পোহাল শারদ-প্রাতে।'

২.৫ 'দিনেরবেলা বাঁশী তোমার বাজিয়েছিলে।'

৩. **সমোচ্চারিত বা প্রায়-সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দযুগলের অর্থপার্থক্য দেখাও :**

দীপ—	দর—	শাখ—	বাধা—	নিত্য—
দ্বীপ—	দড়—	শাঁখ—	বাঁধা—	নৃত্য—

শব্দার্থ : প্রভাত — সকাল। নিশা — রাত্রি। শ্রেণিহারা — দল থেকে বিচ্ছিন্ন। পাখে — ডানায়। পাকুড় — বট জাতীয় গাছ বিশেষ। শাখে — শাখায়, গাছের ডালে। দোচালা — দুটি ছাদ বা চাল যুক্ত বাড়ি। মুদিল --- নিমীলিত করল, বুজল। তরে --- জন্যে। আহ্বান --- আমন্ত্রণ, ডাক। বিদ্রূপ — ব্যঙ্গ, ঠাট্টা। জীর্ণ — বহু ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত। কোলাহল — গোলমাল, চিৎকার। ছিন্ন — ছেঁড়া। চরণচিহ্ন — পায়ের চিহ্ন। পসরা — পণ্যদ্রব্য। ক্রেতা — খরিদ্দার। বিমল — নির্মল। সহি --- সহ্য করি। পরখ --- যাচাই করা। বিকায় --- বিক্রি হয়। হেলায় --- অবহেলায়। নিত্য — রোজ। গাঁট — ট্যাঁক, সঞ্চয়স্থান।

৪. **নীচের শব্দগুলি গদ্যে ব্যবহার করলে কেমন হবে লেখো :** সহিয়া, সেথা, সহি, সবে, তবে, মুদিল।

৫. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর লেখো :**

৫.১ কতগুলি গ্রামের পরে সাধারণত একটি হাট চোখে পড়ে?

৫.২ হাটে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে না কেন?

৫.৩ কার ডাকে রাত্রি নেমে আসে?

৫.৪ ও পারের লোক কেন এ পারেতে আসে?

৫.৫ 'হিসাব নাহিরে — এল আর গেল
কত ক্রেতা বিক্রেতা।' — কোনো হিসাব নেই কেন?

৬. **কবিতায় বর্ণিত হাটের চেহারাটি কেমন লেখো :**

হাট বসার আগে	হাট চলাকালীন	হাট ভাঙার পর

৭. **নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :**

৭.১ হাটের স্থান ছাড়িয়ে দূরের গ্রামের ছবি কীভাবে কবিতায় ফুটে উঠেছে?

৭.২ প্রকৃতির ছবি কীরূপ অসীম মমতায় কবিতায় আঁকা হয়েছে—তা আলোচনা করো।

৭.৩ 'বাজে বায়ু আসি বিদ্রুপ-বাঁশি'—কবির এমন মনে হওয়ার কারণ কী বলে তোমার মনে হয়?

৭.৪ 'উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে চিরকাল একই খেলা।' — কোন প্রসঙ্গে কবি আলোচ্য পঙক্তিটি লিখেছেন? তিনি এখানে কোন 'খেলা'-র কথা বলেছেন? 'চিরকাল' চলে বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

৭.৫ তোমার দেখা কোনো হাটের/বাজারের অভিজ্ঞতা জানিয়ে দূরে থাকে এমন কোনো বন্ধুর কাছে একটি চিঠি লেখো?

৭.৬ তোমার দেখা একটি হাট বা বাজারের ছবি তুমি এঁকে দেখাও।

৭.৭ এখন 'হাট' ও 'বাজার'-এর মধ্যে কোনো তফাত খুঁজে পাও? এ বিষয়ে তোমার মতামত জানিয়ে পাঁচটি বাক্য লেখো।

মাটির ঘরে দেয়ালচিত্র

তপন কর

দেয়ালচিত্র এঁকে থাকেন সাধারণত গ্রামের মেয়েরাই। সেই চিত্রণের বিষয়বস্তু যেমন নিজেরা নির্বাচন করেন, তেমনি তার উপাদানও নিজেরাই সংগ্রহ করেন। আর এর জন্য প্রয়োজনীয় সময়ও তারা বের করে নেন সংসারের নিজস্ব নিয়মিত কাজগুলির মধ্যেই।

লোকে যাকে চলতি ভাষায় পুরুল্যা বলেন, সাধুভাষায় বলেন পুরুলিয়া, সেই জেলাকে কেন্দ্র করে একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে লোকসমাজে দেয়ালে ছবি আঁকার চল আছে। পূর্বতন মানভূম জেলার ভৌগোলিক সীমানাটিকে বাংলার দেয়ালচিত্র চর্চার পীঠস্থান বলা যায়। এর সঙ্গে সংলগ্ন জেলা মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান জেলার পশ্চিম অংশ, বীরভূম জেলাতে প্রচুর দেয়ালচিত্রণ হয়ে থাকে।

মানভূমে সাঁওতাল, হো, অসুর, ভূমিজ, মুন্ডা, ওঁরাও, খেড়িয়া, শবর, কোল, বীরহড় প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষের বসবাস থাকলেও এদের মধ্যে মাটির ঘর তৈরি তথা দেয়ালচিত্রের ক্ষেত্রে সাঁওতালরাই অগ্রসর। পাশাপাশি ভূমিজ ও খেড়িয়াদের চিত্রণও যথেষ্ট উন্নত।

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই মাটি সুলভ হওয়ায় মানুষ গৃহনির্মাণের প্রধান উপকরণ হিসাবে মাটিকেই বেছে নিয়েছে। মাটির ঘরের দেয়ালের এই চিত্রণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, এগুলি অস্থায়ী। সাধারণত আশ্বিনের দুর্গাপূজা ও কার্তিকের অমাবস্যা বা দীপাবলি, এই দুই উৎসবকালকে উপলক্ষ করে দেয়ালচিত্রগুলি রচিত হয়। চিত্রণগুলি গৃহের সৌন্দর্যের জন্য অলংকার হিসেবে করা হয়। সাধারণভাবে লালচে 'গিরিমাটি' বা গৈরিক বর্ণের মৃত্তিকায় 'গিরিফল' চুবিয়ে গৃহদ্বারের শীর্ষে ও দুইপাশে ছাপ দেওয়ার প্রথা বাংলার কৃষিজীবী সমাজে প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়।

সাঁওতাল ভূমিজ, মাহাত বা কুর্মি, বাউরি, শবর ইত্যাদি গোষ্ঠীগুলি কালীপূজা অর্থাৎ কার্তিকের অমাবস্যাকেই গৃহ-মার্জনা ও অলংকরণের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। এই তিথিতেই রাঢ়বঙ্গের কৃষিজীবী সমাজের প্রাচীন উৎসব গো-বন্দনা, অলক্ষ্মী বিদায়, কাঁড়াখুটাঁ, গোরুখুঁটা প্রভৃতি পালিত হয়। সমগ্র ঘর-বাড়ি মেরামতি, লেপা-মোছা করার পর গৃহাঙ্গনের প্রবেশদ্বার থেকে উঠান, গোহাল, ধানের গোলা বা মরাই এবং মূল বাসগৃহ, সর্বত্র আলপনা দিয়ে সাজানো হয়।

মূলত জ্যামিতিক আকার-আশ্রিত বর্ণ সমাবেশেই রচিত হয় সাঁওতালি দেয়ালচিত্র। এতে যেমন দেখা যায় চওড়া রঙিন ফিতের মতো সমান্তরাল রেখা তেমনি থাকে চতুষ্কোণ ও ত্রিভুজের ছড়াছড়ি। চতুষ্কোণের ভিতর চতুষ্কোণ বসিয়ে করা হয় নকশা কিংবা ত্রিভুজের ভিতর বসানো হয় আরও ত্রিভুজ। সাধারণত ঘরের চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে থাকা মূল বেদিটিকে করা হয় কালো। তার সমান্তরালে টানা হয় বিঘতখানেক চওড়া গেরুয়া রঙের একটি রেখা, আবার তার উপর সমান ছাড় দিয়ে আর একটি সমান্তরাল কালো রেখা। এর উপরে সাদা, আকাশি, গেরুয়া বা হলদে রঙের রেখা দিয়ে চতুষ্কোণ বা ত্রিভুজগুলি হতে পারে। সেগুলি পাশাপাশি বসে দেয়ালটিকে ভরিয়ে তোলে। সাধারণত এভাবে মাটি থেকে ছ-ফুট পর্যন্ত উচ্চতায় চিত্রণটি বিস্তৃত হয়।

সাঁওতাল ব্যতীত অন্যদের মধ্যে ভূমিজ, কুর্মি বা অন্যান্য গোষ্ঠীর মানুষেরা যে চিত্রণ করে থাকেন তার সাধারণ লক্ষণ হল পদ্ম। একটা বৃত্তের পরিধিতে যেকোনো বিন্দুকে কেন্দ্র করে আরেকটি বৃত্ত টানলে পরিধির উপর যে ছেদবিন্দুদ্বয় পাওয়া যায় তার উপর পুনরায় কেন্দ্র করে ক্রমাগত বৃত্ত টানতে থাকলে ক্রমে একটি পদ্মের রেখাচিত্র পাওয়া যায়। এই পদ্মের পাপড়িগুলি বিচিত্র বর্ণে ভরে দেওয়া হয়। কখনো

কখনো দেখা যায় একটা টব বা কলস থেকে ফুলের গাছটি উঠে আসছে এবং দু-পাশে শাখা ছড়িয়ে শাখার আগায় ফুল ফোটাচ্ছে। সেখানেও বিকশিত পুষ্পটি শতদল বলেই বোঝা যায়। এই পদ্মটিকে মানভূমী দেয়ালচিত্রের প্রতীক বলা হয়।

এর পাশাপাশি অপর যে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় তাহলো 'মোরগঝুঁটি'। এটি খুবই জনপ্রিয় এবং বিশেষত্বপূর্ণ। যখন মোরগঝুঁটিকে চালচিত্রের মধ্যে স্থাপন করে অন্যান্য মোটিফ সংযুক্ত করে জড়োয়া সাজ করা হয় তখন বলা হয় মোরগঝুঁটির ঝাড় বা মুরগা ঝাড়। চালচিত্রটির ধারে ধারে সারিবদ্ধ থাকে উদীয়মান সূর্যের নকশা। সূর্যগুলির ফাঁকে ফাঁকে উঠে আসে একটি করে আধফোটা পদ্ম। এর বাইরে যে শূন্যস্থান পড়ে থাকে সেখানে বসানো হয় নানারকমের ছোটো ছোটো মোটিফ। সেগুলির মধ্যে পদ্ম তো থাকেই, তার সঙ্গে ইস্কাবন, হরতনের চিহ্ন ও সাধারণ লতাপাতা, পাখি, ময়ূর ইত্যাদিও থাকে। উল্লেখ্য, এই ধরনের বিস্তৃত আকারের ছবি যেমন লাল, নীল, সাদা, গেরুয়া ইত্যাদি বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ আঁকা হয়, তেমনি বর্ণ ছাড়াও আঁকা হয়।

অত্যন্ত মসৃণভাবে নিকানো দেয়ালে অপেক্ষাকৃত হালকা রঙের বেলেমাটির গোলা দিয়ে নাতা দেওয়া হয়। এই মাটির রং ঈষৎ হরিদ্রাভ ও সাদাটে। সাদাটে বলেই এ মাটির স্থানীয় নাম 'দুধেমাটি'। এই মাটির প্রলেপটি ভিজে থাকতে থাকতেই এর উপর হাতের আঙুলের ডগা দিয়ে দাগ টেনে এঁকে দেয় ছবি।

বিষয় হিসেবে পূর্বে বর্ণিত মোরগঝুঁটির ঝাড় তো থাকেই, তার সঙ্গে 'কদমঝাড়', 'শালুকলতা'-ও প্রায়শ চোখে পড়ে।

এই চিত্রকলা কোনো গোপন স্থান বা আড়ালে করার রীতি নেই, বরং দূর থেকে দৃশ্য হিসেবে মানানসই হবে এমনভাবেই দেয়াল নির্বাচন করা হয়। সেজন্য শুধু বাসগৃহের দেয়াল নয়, প্রাচীরগাত্র কিংবা অন্য যেকোনো রকম ঘরের দেয়ালও নির্বাচিত হয়।

হাতেকলমে

তপন কর (জন্ম ১৯৫৪) : হাওড়ায় বসবাস করেন। সরকারি চারু ও কারু মহাবিদ্যালয় থেকে ১৯৭৫ সালে স্নাতক হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। বর্তমানে সরকারি বিদ্যালয়ের শিল্প শিক্ষক। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য বই– *অসামান্য মানভূম, ছবি আঁকতে শেখা* প্রভৃতি। *মাটির ঘরে দেয়ালচিত্র* রচনাংশটি লেখকের *মাটির ঘরে দেয়ালচিত্র* প্রবন্ধের একটি সংকলিত ও সংক্ষেপিত অংশ।

১.১ লেখক তপন করের লেখা একটি বই-এর নাম লেখো।

১.২ পাঠ্য রচনাংশটি কোন বিষয়ে লেখা?

২. **ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে লেখো :**

২.১ দেয়াল চিত্র এঁকে থাকেন সাধারণত গ্রামের (পুরুষেরা/মেয়েরা/বালকেরা)।

২.২ মূলত (বৃত্তাকার/সরলরৈখিক/জ্যামিতিক) আকার-আশ্রিত বর্ণসমাবেশেই রচিত হয় সাঁওতালী দেয়ালচিত্রণ।

২.৩ সাধারণত মাটি থেকে (ছ'ফুট/চারফুট/আটফুট) পর্যন্ত উচ্চতায় চিত্রণটি বিস্তৃত হয়।

২.৪ (শালুকটিকে/পদ্মটিকে/গোলাপটিকে) মানভূম দেয়ালচিত্রের প্রতীক বলা হয়।

শব্দার্থ : দেয়ালচিত্র — দেয়ালের গায়ে আঁকা ছবি। চিত্রণ — ছবি, প্রতিকৃতি। পূর্বতন — বিগত। পীঠস্থান — সুপ্রাচীন দেবস্থান বা দেবমন্দির। গৃহাঙ্গন — গৃহ সংলগ্ন আঙিনা। চতুষ্কোণ — চার কোণ বিশিষ্ট। নিকানো — লেপন করা। হরিদ্রাভ — হলদেটে, পীতবর্ণযুক্ত।

৩. **পাঠ থেকে একই অর্থের শব্দ খুঁজে নিয়ে লেখো :** ছবি, জোগাড়, পঙ্কজ, পুষ্প, মাটি।

৪. **নীচের বিশেষ্যশব্দগুলিকে বিশেষণ এবং বিশেষণশব্দগুলিকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত করো :**

ভৌগোলিক, নির্বাচন, অঞ্চল, রচিত, অলংকার, জ্যামিতি।

৫. তোমাদের এই পাঠ্যাংশ থেকে দুটি জটিল বাক্য লেখো যারা যুক্ত আছে 'যেমন-তেমন' দিয়ে। এছাড়া, 'যদি-তবে', 'যখন-তখন', 'যে-সে', 'যেখানে-সেখানে', 'যেদিন-সেদিন' ইত্যাদি ব্যবহার করে একটি করে জটিল বাক্য লেখো।

৬. নীচের বাক্যগুলি জুড়ে একটি বাক্যে পরিণত করো :

৬.১ এই মাটির রং ঈষৎ হরিদ্রাভ। এই মাটির রং ঈষৎ সাদাটে।

৬.২ দূর থেকে দৃশ্য হিসেবে মানানসই হওয়া চাই। এই ভাবেই দেয়ালগুলি নির্বাচন করা হয়।

৬.৩ ঘরের চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে থাকে একটি বেদী। তার রং কালো।

৬.৪ বাংলার কৃষিজীবী সমাজের কিছু প্রাচীন উৎসব আছে। এগুলি হলো গো-বন্দনা, কাঁড়াখুঁটা, গোরুখুঁটা প্রভৃতি।

৭. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

৭.১ তোমার জানা কোন অঞ্চলের লোকসমাজে দেয়ালে ছবি আঁকার চল আছে?

৭.২ মানভূম জেলা সংলগ্ন আর কোন কোন জেলায় দেয়াল চিত্রণ হয়ে থাকে?

৭.৩ মানভূম জেলায় কোন কোন আদিবাসী গোষ্ঠীর বাস?

৭.৪ মাটির দেয়াল চিত্রগুলি সাধারণত কোন কোন উৎসবে আঁকা হয়?

৭.৫ দেয়াল চিত্র করার জন্য কী কী উপাদান ব্যবহৃত হয়?

৭.৬ কোন তিথিতে কৃষিজীবীরা কীভাবে তাদের গৃহসজ্জা করে তা লেখো।

৭.৭ কোন কোন জাতির দেয়াল চিত্রের সাধারণ লক্ষণ পদ্ম?

৭.৮ দুধেমাটির ওপর কী ভাবে চিত্রণ করা হয়?

৭.৯ মোরগঝুঁটির চালচিত্রে আর কী কী নকশা থাকে?

৮. বৃত্তাকার একটি নক্শা বা আলপনা আঁকো যা তোমার বাড়িকে আরও সুন্দর করে তুলবে।

ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের ওয়ারলি দেওয়াল চিত্রের একটি নমুনা।

গান

ঝুমুর

দুর্যোধন দাস

মাঘ মাসে সিম মিঠা
খুখড়ির ডিম গো
ফাগুনেতে, মিঠা বাগানের নিম।
চৈত মাসে শ্রীফল মিঠা,
খাঞে ছিল রাম গো
বৈশাখেতে, মিঠা গেঁতি মাছে আম গো॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে আম মিঠা
আষাঢ়ে কাঁঠাল গো,
বনবাসে, খাল্য কৌশল্যা দুলাল গো॥
দাস দুর্যোধন ভনে,
দহি মিঠা শ্রাবণে,
ভাদর মাসে, মিঠা পাকাতাল দু-গুণ গো॥

দুর্যোধন দাস : ১৮৬১ তে পুরুলিয়া জেলার বাগমুন্ডী থানার শ্যামনগর গ্রামে জন্ম। বাবা শত্রুঘ্ন দাস। জমিদার বিচন্দিত সিং-এর দেওয়ান। রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলীর দলে ঢোলবাদক হিসেবে জীবন শুরু করে পরে ঝুমুর এবং নাচনির তিনজন প্রবাদপুরুষদের মধ্যে একজনে পরিণত হন। বাঘমুন্ডী রাজবাড়ির সঙ্গে আজীবন যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত প্রবাদটি হলো : রামকৃষ্ণের গলা অজমতের চলা দুর্যোধনের বলা।

পিঁপড়ে

অমিয় চক্রবর্তী

আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে ঘুরুক দেখুক থাকুক
কেমন যেন চেনা লাগে ব্যস্ত মধুর চলা—
স্তব্ধ শুধু চলায় কথা বলা—
আলোয় গন্ধে ছুঁয়ে তার ওই ভুবন ভরে রাখুক,
আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে ধুলোর রেণু মাখুক।।
ভয় করে তাই আজ সরিয়ে দিতে
কাউকে, ওকে চাইনে দুঃখ নিতে।
কে জানে প্রাণ আনল কেন ওর পরিচয় কিছু,
গাছের তলায় হাওয়ার ভোরে কোথায় চলে নীচু—
আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে সেই অতলে ডাকুক।
মাটির বুকে যারাই আছি এই দু-দিনের ঘরে
তার স্মরণে সবাইকে আজ ঘিরেছে আদরে।।

হা
তে
ক
ল
মে

অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬) : আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান কবি। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। *একমুঠো, পারাপার, পালাবদল, পুষ্পিত ইমেজ, ঘরে ফেরার দিন* তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যু পলজ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৬৩ সালে *সাহিত্য অকাদেমি* পুরস্কার পান।

১.১ অমিয় চক্রবর্তী কোথায় অধ্যাপনা করতেন?

১.২ তাঁর দুটি কবিতার বইয়ের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :**

২.১ কবির কী দেখে 'কেমন যেন চেনা লাগে' মনে হয়েছে?

২.২ 'কেমন যেন চেনা লাগে' — কথাটির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

২.৩ কবি কাউকে দুঃখ দিতে চাননি কেন?

২.৪ 'কোন অতলে ডাকুক' — কে কাকে এই ডাক দেয়?

২.৫ কবি আজ প্রাণের কোন পরিচয় পেয়েছেন?

২.৬ 'দু দিনের ঘর' বলতে কী বোঝ?

৩. প্রার্থনা, নির্দেশ, অনুরোধ বোঝাতে বাংলায় ক্রিয়ার শেষে 'উক' যোগ হয়। (যেমন এই কবিতায় থাক্ + উক = থাকুক) কবিতা থেকে এমন আরো পাঁচটি শব্দ খুঁজে বের করো।

৪. **নীচের সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দগুলির অর্থ পার্থক্য দেখিয়ে প্রত্যেকটি ব্যবহার করে পৃথক পৃথক বাক্য রচনা করো।**

ভরে—	ঘরে —	ছুঁয়ে —	আনল —	মধুর —
ভোরে —	ঘোরে—	চুঁয়ে —	অনল —	মেদুর—

৫. **পাশের শব্দঝুড়ি থেকে ঠিক শব্দ বেছে নীচের ছকটি সম্পূর্ণ করো।**

☐	>	পিঁপড়ে	ধুলো	>	☐
মৃত্তিকা	>	☐	যাহারা	>	☐

শব্দঝুড়ি
মাটি, পিপীলিকা
যারা, ধূলা

৬. কবিতা থেকে সর্বনামগুলি খুঁজে বের করে আলাদা আলাদা বাক্যে ব্যবহার করো।

৭. **নীচের স্তম্ভদুটি মেলাও:**

বি	দিন
প্রতি	স্মরণ
অ	মধুর
কু	চেনা
সু	কথা

৮. **কবিতা থেকে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়াগুলি খুঁজে নীচের খোপে যথাস্থানে বসাও :**

সমাপিকা	অসমাপিকা

৯. **দুটি বাক্যে ভেঙে লেখো :**

মাটির বুকে সবাই আছি এই দু-দিনের ঘরে তার স্মরণে সবাইকে আজ ঘিরেছে আদরে।

১০. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো:**

১০.১ পিঁপড়ের ভাষাহীন চলাচলের মধ্যে বিনিময়ের ভঙ্গিটি কেমন?

১০.২ ‘মাটির বুকে যারাই আছি এই দুদিনের ঘরে’ — ‘এই দু-দিনের ঘরে’ বলতে কী বোঝ? কে সবাইকে কীভাবে ‘এই দু-দিনের ঘরে’ আদরে ঘিরে রাখে?

১০.৩ এই কবিতায় কবির কীরূপ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা বুঝিয়ে দাও।

১০.৪ বিভিন্ন রকমের পিঁপড়ে এবং তাদের বাসস্থান, খাদ্যাভ্যাস ও জীবনপ্রণালী সম্বন্ধে তোমার পর্যবেক্ষণগুলি একটি খাতায় লেখো। প্রয়োজনে ছবিও আঁকতে পারো।

১০.৫ একটি লাল পিঁপড়ে ও একটি কালো পিঁপড়ের মধ্যে একটি কাল্পনিক কথোপকথন রচনা করো।

পড়ে দেখো :

গিরীন্দ্রশেখর বসুর ‘লালকালো’ ।

সত্যজিৎ রায়ের ‘সদানন্দের খুদে জগৎ’।

ফাঁকি

রাজকিশোর পট্টনায়ক

আটশো টাকা গুণ্ঠ দরে জমি কিনে বাড়ি করার সময়ে বাপে আর ছেলেতে সর্বদা এক কথা—কোথায় বাড়ি হবে। ছেলে বলে, রাস্তার ধারে করা যাক, তাহলে রাস্তা থেকে নামলেই সহজে বাড়িতে ঢোকা যাবে। বাপ বলেন—এমন মরুভূমির মধ্যে কেউ বাড়ি করে না। চারিদিকে পাথরের মতো শক্ত শুকনো মাটি, এর মধ্যে বাড়ি করার মানে কী?

—তাহলে কী করা যায়, বাবা?

—এটুকু জমি খালি রাখা যাক, গাছপালা কিছু—

—হ্যাঁ বাবা, বাগান করব।

—আগে গাছ লাগাব। তার পরে যত বাগান করবে করো।

—কী গাছ?

—আম গাছ পুঁতব এইখানে। কলমি গাছ। আমি একটা কলমি গাছ করেছি— বিরিবাটির বাগানে।

ভালো আম। সেই যে ভাগলপুর থেকে ল্যাংড়া আম আনিয়েছিলাম—মনে নেই তোর?

গোপাল মুখ তুলে সন্দিগ্ধভাবে বাবার দিকে তাকাল। বাবা কী কলম করেছিলেন কে জানে! গাছ কি ভালো হবে? ফুলের বাগান করলে কী সুন্দর হতো।

—বাবা, ফুলের বাগান করলে ভালো হতো না?

—এখানকার মাটি বেলে মাটি। জল দেবারও সুবিধা নেই।

—বাবা, আমি জল দেব।

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ, তুই তো নিজের হাতে জল তুলে চানটুকুও করতে পারিস না! তুই করবি বাগান!

—না বাবা!

—বেশ করবি তো কর। একটা আমগাছ এখানে থাকবে। তুই যত ফুলগাছ লাগাবি লাগা।

আমের চারা আসলো — ছোটো একটি হাঁড়ির মধ্যে। কালো মাটির উপরে একহাত উঁচু আমগাছ। সবশুদ্ধ গণ্ডা আষ্টেক পাতা হলেও হতে পারে।

—বল তো রে, কোথায় পোঁতা হবে।

—বাবা, মাঝখানে পোঁতো। নইলে এর ডালপালা পাঁচিল ডিঙিয়ে বাইরে চলে যাবে, রাস্তার ছেলেরা উৎপাত করবে। গাছের জন্য কোঁদল লাগবে, বাইরের কোঁদল এসে ঘরে ঢুকবে।

—তোর কেবল ওইসব কথা।

বাপের কথায় রাগ করে গোপাল চলে গেল বাড়ির ভিতর— মায়ের কাছে নালিশ করতে।

—দেখো তো মা, বাবা আমগাছ নিয়ে পাঁচিলের কাছে লাগাচ্ছেন। গাছে আম ফললে পাড়ার ছেলেরা কি আর রাখবে?

—ওগো! আমগাছ ওখানে কেন লাগাচ্ছ? গোপাল এদিকে রাগ করছে।

—ওঃ! তোমার ছেলে কিছু করবে না, খালি—এই আমগাছ হবে, তার ডাল পাঁচিল টপকাবে, রাস্তার ছেলেরা ঝগড়া বাঁধাবে—এইসব! খুব হয়েছে, মা আর ছেলের একইরকম বুদ্ধি।

—হ্যাঁ, একইরকম বুদ্ধি। ওখানে গাছ লাগানো হবে না।

—আমি বলছি হবে। আমার জমিতে আমি গাছ লাগাব।

—অ্যাঁ, তোমার জমি? জমি আমার। তোমার নামে আছে, না?

—যা পালা বলছি।

মায়ে-পোয়ে ঘরের ভিতরে চলে গেল, বিশেষ আলোচনার জন্য।—বাবা সব খারাপ করে দিচ্ছেন। বেশ, করুন।

ঝগড়ার ফলে গাছ সরলো—দুই হাত ভেতরের দিকে। জল দেওয়া হলো। জন্তু জানোয়ার ঠেকাবার জন্য কঞ্চি দিয়ে বেড়াবন্দি করা হলো।

সকালে গোপাল আর গোপালের মা উঠে প্রথমেই গেল আমগাছ দেখতে, গাছ নেতিয়ে পড়ে নেই তো? না, বেশ তাজা আছে।

মাকে গোপাল চুপি চুপি বলল—গাছটাকে আর দু-হাত ভেতরে লাগালে কত ভালো হতো।

—আচ্ছা, এখানেই থাক। বাবা ভারি একগুঁয়ে, কী আর করা যাবে?

—মা, আমি কিন্তু এ গাছের কিছু করতে পারব না।

কারো হেপাজতের দরকার হয়নি। আপন চেষ্টাতেই গাছটি বেড়েছে। মা আর ছেলেতে কথা হয় —কলম ঠিক মতো করা হয়নি। সে কথা বাবাকে বলতে গিয়ে দুজনে বকুনি খায়।

সে বাড়ির নিশানা হয়েছে আমগাছটি। কেউ গোপালবাবুকে তার বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বোঝান—কাঠজোড়ি নদীর ধার বরাবর পুরীঘাট পুলিশের ফাঁড়ির পশ্চিমে যেখানে পাঁচিলের মধ্যে আমগাছ দেখবেন সেইখানে আমাদের বাড়ি।

অনেক বন্ধুর কাছে এই দুষ্ট আমগাছটা ছন্নছাড়া স্বভাবের মানুষ গোপালবাবুর সহজ পরিচয় হয়ে দাঁড়ায়। গাছ আপনাআপনি বাড়ছে, আলো বাতাস আর মাটি থেকে সে তার আহার যোগাড় করে বাড়ির পাহারাদারের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

নদীর ধারে গ্রীষ্মের গরম বাতাস সে তার সবুজ বুক দিয়ে ঠেকায়। কাঠজোড়ি নদীর দিক থেকে ছুটে আসা গরম বালির ঝাপটা আপন দেহ দিয়ে আটকায়। সর্বদা সকলের কাছ থেকে নানা অত্যাচার সহ্য করে সে চুপচাপ আপন মনে দাঁড়িয়ে থাকে।

গোপাল তার বন্ধুদের এনে সেই আমগাছের তলায় বসায়। সবাই তারিফ করে, বলে এমনি জায়গায় এমনি আমগাছতলায় বসে যত ইচ্ছা বই লেখা যায়। গোপাল খুশি হয়ে বলে—এটা আমাদের পোষা গাছ, তাই এত সুন্দর হয়েছে। গাছ লাগানোর ইতিহাস গোপালের আর মনে ছিল না।

শহর জায়গা। অনেক দূর থেকে লোকের এই আমগাছটির কথা মনে পড়ে। পূজা, বিবাহবাড়ি—সব কাজে গোপালবাবুর কাছে অনুরোধ আসে আমপাতার জন্য, আমের ডালের জন্য।

কেউ চাইতে আসলে গোপালবাবু নিজে এসে গাছের কাছে দাঁড়ান—কচি পাতা নিও না, ওই থাক, এত পাতা গেলে গাছে কি আর ফল ধরবে? কত লোক আসবে, ওই থাক।

এমনি অশেষ সাবধানতার সঙ্গে গোপাল সেই ডাল-পাতা বিলোয়। পোষা আমগাছের পাতাগুলি সব বুঝি গোনাগুনতি হয়ে আছে। বাড়ির সবাইকার এক চিন্তা—গাছে কবে ফল ধরবে?

—এই, দেখেছ? আমগাছে বোল ধরেছে।

—বাঃ, ভালো বোল হয়েছে, সব ডালে। আহা, বোল মোটে যদি না ঝরে পড়ে, কত আম হবে।

—কেমন আম হয় দেখা যাবে।

—জাত আম।

—কে জানে, বাবা তো নিজেই কলম করেছেন। ভালো কলমি গাছ ফার্ম থেকে আনলে হতো না? তা না, নিজেই কলম করেছেন।

—আমরা ও আম খাব না।

—বাবা, আমরা তোমার আমগাছের আম মোটে খাব না। মা বলছে ভালো আম নয়।

—বেশ খেও না। গাছ তো কেঁদে ভাসাবে কিনা তোমরা না খেলে।

কিন্তু সকালে সকলের মুখে উদ্‌বেগ। কুয়াশা হয়েছে। আমের বোল ঝরে যাবে—এই দেখো, বাতাসে মটরদানার মতো বোল ঝরে ঝরে পড়ছে। আগুন লাগানে পিঁপড়েগুলো সব খেয়ে ফেললে।

—আচ্ছা করে ডিডিটি দেব, পিঁপড়ে মরে যাবে।

—আরে, আম হয়েছে— !

বাড়িসুদ্ধ সকলে মিলে গুনতে আরম্ভ করে। অনেকবার গোনা হয়। পাতার আড়ালে আবার কোথায় একটা বাকি রয়ে যায়, হিসেবে ভুল হয়।—দেখো ছেলেরা, গুনে রাখ। দেখা যাবে কটা আম হয় এতখানি বোল থেকে।

পাড়ার ছেলেদের চোখে পড়ে যায়। ঢিপ ঢাপ ঢিল ছোড়া শুরু হয়।

—এই, নজর রেখো এই ছেলেগুলোর উপরে।

আম হলে কেউ তো খাবেই। দুপুরে নজর রাখা এক কাজ হলো। প্রত্যেকটি আম এক একটি অমূল্য সম্পদ। পাকলেও আমের উপরটা সবুজ রয়েছে। ভেতরকার রং হলদে না হলেও গেরিমাটির রং দেখাচ্ছে। টক না হলেও মিষ্টি নয়। সবাই এক এক ফালি খেয়ে তারিফ করে—বাড়ির হাঁদা ছেলেকে সবাই যেমন আদর করে গায়ে হাত বুলায়।

—আমাদের আম খুন্টুনি দিয়ে পাড়ব। দেখেশুনে পাড়লে নীচে পড়ে থেঁতলে যাবে না।

বাড়ির সবাই মিলে খুব সাবধানে আম পাড়ে।

—আরে দেখেছ! ভালো করে দেখো, কাঠবিড়ালি আর বাদুড়ের চোখ এড়ায় না কোনো আম। আমরা এতজনে মিলে আম পাড়লাম, তবু রোজ কাক বাদুড় কাঠবিড়ালির এঁটো করা আম পড়ছে কোত্থেকে কে জানে! পিঁপড়েও মরেনি, আধখাওয়া আমে ঠিক লেগে আছে।

এত যত্ন করে যে কয়টা আম ঘরে তোলা হয় তার গোনা-গুনতি দুই চারটি করে বিলানো হয় আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের। বাড়ির সকলের সঙ্গে একেবারে মিলে মিশে গিয়ে আমগাছটি পরিবারের একজনের মতো হয়ে উঠেছে। কেবল তার নাম দেওয়া হয়নি এই যা।

এই যুদ্ধের সময় আমগাছের উপর দিয়ে এক বিপদ যাচ্ছে। উড়োজাহাজ থেকে যদি বোমা পড়ে তবে তার হাত থেকে বাঁচবার জন্য সরকারের লোক ট্রেঞ্চ খুঁড়ে রেখে গেছে একেবারে আমগাছের গোড়া পর্যন্ত। সেইদিন থেকে গাছ হেলে পড়েছে পূর্ব দিকে। যতই ঠেকো দেওয়া যাক, সিধে হচ্ছে না। কী করা যায়? শিশুকালে টাইফয়েড হলে ছেলে যেমন চিরদিন রুগ্ন থেকে যায়, তেমনি — বোমা তো পড়ল না—ট্রেঞ্চ খুঁড়ে আমগাছটিকে কমজোর করে দিয়ে গেল। খোঁড়া মানুষের হাতে যেমন লাঠি দেওয়া হয়, হেলে পড়া আমগাছকে একটা পেয়ারা গাছের দো-ফেঁকড়া শক্ত ডাল দিয়ে তেমনি ঠেকো দেওয়া হয়েছে। পিঁপড়ে কাঠবিড়ালি সেইদিক দিয়ে আর একটি পথ খুলে গাছের উপর যাওয়া আসা করছে। লোক এলে গেলে তার গায়ে সাইকেল ঠেসান দেয়।

ফি বছরই সেই এককথা — এ বছর কত আম ফলবে? তিন বছরে একবার ফলন ভালো হয়। গেল বছর হয়েছিল একশো থেকে পাঁচটি কম। এবার দেখা যাক।

কারো হঠাৎ দয়া হলে দুই এক তাল গোবর নয়তো এক ঘটি জল ঢেলে দেয় গাছতলায়। সকলের নজর গাছের পাতার দিকে। এ বছর কাউকে পাতা দেওয়া হবে না, গাছ কাহিল হয়ে যাবে, ফলবে না।

—মা, গাছটা রাস্তার উপরে বড্ডো ঝুঁকে পড়েছে, যেতে আসতে মাথায় লাগে, বৃষ্টির সময়ে পাতার জলে গা ভিজে যায়। কেটে দেব কয়টা ডাল?

—দ্যাখ গোপাল, আমগাছে হাত দিলে ঝগড়া হবে তোতে আমাতে। এমনি শাসানি সত্ত্বেও গোপাল চুপি চুপি কয়েকটা সরু সরু ডাল কেটে ফেলে, কেটে একেবারে বাইরে ফেলে দিয়ে আসে। মা জানবার কী দরকার, রাস্তাটা সাফ হলেই হলো।

তবু গাছটার কত মায়া। তার পাতার আড়ালে সব ক্ষতচিহ্ন সে লুকিয়ে ফেলে। গোপালের মায়ের চোখ তা ঠাহর করতে পারে না। গোপাল গিয়ে হাত বুলিয়ে দেয় গাছের গায়ে। ঠিক বন্ধুর মতোই গাছ সব কথা লুকিয়ে রেখেছে।

সে বাড়ির একটা অঙ্গ সেই গাছটি, বাইরের লোককে পথ দেখাবার জন্য বাইরের বিজলি আলো জ্বালিয়ে গাছ তা আড়াল করে দেয়। ভেতরের কথা লুকিয়ে রাখে বাইরের লোকের কাছে। বাইরের লোককে আপন আড়ালের ওপাশে রাখে।

কত ঝড় বৃষ্টি গিয়েছে, প্রতি বছর যত ফুল ফল কুঁড়ি ও পাতা সে ফেলেছে আবার ততই এসে ভরেছে। গোপাল বড়ো হয়ে বুড়ো হতে চলল, গোপালের বাবা মা ভাইবোন ভাগনে ভাইপো সকলেই এগোচ্ছে, গাছটির বয়স বাড়ে না। হয়েছে কাছের দালানটার সমান উঁচু। যতখানি জায়গা নিয়েছিল তেমনি রয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখে মানুষের ছেলেরা ছোটো থেকে বড়ো হচ্ছে বুড়ো হচ্ছে।